BENGALI SELECTIONS

APPOINTED BY THE

SYNDICATE OF THE CALCUTTA UNIVERSITY

FOR THE

ENTRANCE EXAMINATION

1895.

COMPILED BY

BANKIM CHANDRA CHATTERJEE.
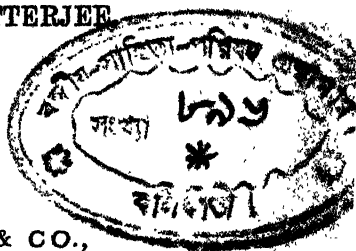
CALCUTTA:
THACKER, SPINK & CO.,
Publishers to the University.

1892.

রুক্মপার্শ্ব নকুল।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সমাপন হইল। দ্বিজগণ, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, [illegible] অন্ধ, দরিদ্র প্রভৃতি সকলে পরিতৃপ্ত হইল; যুধিষ্ঠিরের মহাদান চতুর্দিকে ঘোষিত হইল; যুধিষ্ঠিরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এমন সময়ে সেখানে নীলচক্ষু রুক্মপার্শ্ব এক নকুল আসিয়া বজ্রতুল্য শব্দ করিল। সেই শব্দে পশুপক্ষিসকল বিত্রস্ত করিয়া মনুষ্যবাক্যে সে [illegible]বচনে বলিতে লাগিল,—"হে রাজগণ! উঞ্ছবৃত্তি বদান্য কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক ব্যক্তির শক্তুপ্রস্থ দানের তুল্য আপনাদিগের এই যজ্ঞ নয়।" সেই নকুলের এই বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ সকলে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন নকুলের নিকট সমাগত হইয়া সেই ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"তুমি কোথা হইতে এই সাধুসমাগম যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়াছ? তুমি এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ, কিন্তু তোমার বল ও শাস্ত্রজ্ঞান আমরা জানি না। আমরা [illegible]নুগামী হইয়া, বিবিধ যজ্ঞীয় কৃত্যের দ্বারা এই যজ্ঞ যথাশাস্ত্র ও যথান্যায় সম্পন্ন করিয়াছি। পূজার্হ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রানুসারে বিধিবৎ পূজিত হইয়াছেন। অগ্নিতে মন্ত্রযুক্ত আহুতি প্রদান করিয়াছি, এবং দেয় বস্তু অমাৎসর্যতার সহিত দত্ত হইয়াছে। বহুবিধ দানের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, সৎ যুদ্ধের দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ, শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণ, পালনের দ্বারা কৃষীবল, কামনাপূরণের দ্বারা বরস্ত্রীগণ, অনুগ্রহের দ্বারা [illegible]গণ এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দত্তাবশিষ্টের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছেন। শৌচের দ্বারা জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও রাজগণ, পবিত্র হবির দ্বারা দেবগণ এবং রক্ষণের দ্বারা শরণাগত ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। [illegible] যাহা শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ, তাহা আমরা কৌতূহলবশতঃ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহার যথার্থ তথ্য যাহা, তাহা সত্য [illegible] ব্রাহ্মণগণের নিকট ব্যক্ত কর। তোমাকে প্রাজ্ঞ এবং তোমার বাক্য [illegible] উপযুক্ত বোধ হইতেছে, [illegible] [illegible] দিব্যরূপ শোভমান, [illegible] তোমাকে [illegible] করিতেছি।

ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, সেই নকুল হাসিয়া বলিতে লাগিল,—"হে দ্বিজগণ! আমি যে বলিয়াছি এবং তোমরাও শুনিয়াছ যে, তোমাদের এই যজ্ঞ শক্তুপ্রস্থের তুল্য নয়, এ কথা আমি মিথ্যাও বলি নাই, অথবা দর্পপ্রযুক্তও বলি নাই। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদিগের নিকট আমার ইহা অবশ্য কথিতব্য। অতএব আমি উঞ্ছবৃত্তি বদান্য কুরুক্ষেত্রনিবাসী ব্রাহ্মণের যে অদ্ভুত উৎকৃষ্ট কর্ম্ম দেখিয়াছি ও অনুভূত করিয়াছি, তাহা যথার্থ বলিতেছি, তোমরা অব্যগ্রমনা হইয়া শ্রবণ কর। তন্নিবন্ধন সেই ব্রাহ্মণ, ভার্য্যা পুত্র স্নুষা সহিত স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আমার এই শরীরের অর্দ্ধভাগ কাঞ্চনময় হইয়াছে।"

নকুল বলিতে লাগিল, "হে দ্বিজগণ! আপনাদিগের নিকট সেই ব্রাহ্মণদত্ত ন্যায়লব্ধ অল্প সামগ্রীর উত্তম ফল কীর্ত্তন করিতেছি। ধর্ম্মক্ষেত্র ও ধার্ম্মিকগণপরিবৃত কুরুক্ষেত্রে কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ভার্য্যা, পুত্র, স্নুষা লইয়া বাস করিতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা এবং অক্লিষ্টকর্ম্মা ছিলেন। তিনি পরিবার-বর্গের সহিত দিবসের ষষ্ঠকালে আহার করিতেন। কোনও দিন বা ষষ্ঠকালেও তাঁহার আহার জুটিত না। সুতরাং সে দিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন ষষ্ঠকালে তাঁহাকে আহার করিতে হইত। একদা তথায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। সেই ব্রাহ্মণের কিছুই সঞ্চিত দ্রব্য ছিল না। এবং দেশের শস্য ফুরাইয়া গেল। এমন সময় উপ-স্থিত হইল যে, ব্রাহ্মণের আর কিছুই ভোজনীয় রহিল না। সকলে ক্ষুধাপীড়িত হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল। একদিন শুক্লপক্ষে মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধাপীড়িত এবং রৌদ্রপীড়িত হইয়া তিনি ভক্ষ্যদ্রব্যের আহরণে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা কিছু পাইলেন না। অতএব পরিবারবর্গের সহিত ক্ষুধাপীড়িত হইয়া কৃচ্ছ্রপ্রাণ সেই ব্রাহ্মণ কালযাপন করিতেছিলেন। এমত সময়ে দিবসের ষষ্ঠকাল গত হইলে, যবপ্রস্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন। তখন তাঁহারা কৃতজপাহ্নিক হইয়া এবং যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিয়া সেই যবপ্রস্থ হইতে শক্তু প্রস্তুত করিলেন। পরে সেই শক্তুপ্রস্থকে চারিজনের আহারার্থ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া আহার করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমত সময়ে সেখানে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অতিথি হইলেন। তাঁহারা অতিথি প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিতচিত্ত হইলেন। এবং তাঁহাকে অভি-

খাদন করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বিশুদ্ধমনা, দান্ত, শ্রদ্ধাদমসমন্বিত, অসূয়াশূন্য, জিতক্রোধ, সাধু এবং নির্মৎসর। তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ এবং মানমদক্রোধপরিশূন্য। অতএব ব্রাহ্মণেরা পরস্পরের নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করার পর সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ আপন কুটীরমধ্যে আনয়ন করিলেন, এবং পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিলেন। এবং কহিলেন 'হে প্রভু! এই বিশুদ্ধ শক্তু আমি নিয়মানুসারে উপার্জ্জন করিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! ইহা আপনাকে আমি দিতেছি, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ইহা প্রতিগ্রহ করুন।' এইরূপ অভিহিত হইয়া, সেই অতিথি ব্রাহ্মণ শক্তুর চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া তাহা ভক্ষণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তুষ্টি জন্মিল না। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ, অতিথিকে ক্ষুধাপীড়িত দেখিয়া, কি প্রকারে তাঁহার তুষ্টিসম্পাদন করিবেন, এবং কি প্রকারে আহার সংগ্রহ করিবেন, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, 'আমার ভাগও ইহাঁকে দাও। ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া যেখানে ইচ্ছা গমন করুন।' কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সাধ্বী ভার্য্যাকে ক্ষুধাপ্রপীড়িতা জানিয়া তাঁহার ভাগ গ্রহণ করিলেন না। সেই বিদ্বান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আপনার সেই বৃদ্ধা ভার্য্যাকে ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা, গ্লানিযুক্তা, তপস্বিনী, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা, কম্পমানা বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন,—'হে শোভনে! কীটপতঙ্গপশুদিগেরও স্ত্রীসকল রক্ষণীয়া এবং পোষণীয়া। অতএব তুমি এরূপ বলিও না। পুত্রীর অনুকম্পাতেই পুরুষ পুষ্ট ও রক্ষিত হয়। পিতৃগণের এবং আপনার ধর্ম্মকামার্থ কার্য্য, শুশ্রূষা, কুলসন্ততি এবং ধর্ম্ম, ভার্য্যার অধীন। যে ব্যক্তি ভার্য্যা রক্ষণে অক্ষম, সে কর্ম্মজ্ঞ নহে। সে মহৎ অযশ প্রাপ্ত হইয়া নরকে গমন করে।'

"ব্রাহ্মণী ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"হে ব্রাহ্মণ! তোমার আমার ধর্ম্মার্থ এক, অতএব অনুগ্রহ করিয়া শক্তুর এই চতুর্থ ভাগ গ্রহণ কর। স্ত্রীলোকের সত্য, ধর্ম্ম এবং গুণনির্জ্জিত স্বর্গ এবং অভিলষিত বস্তু সমুদায়ই পতির অধীন। পতি স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। পতি, পালন করেন বলিয়া পতি, এবং ভরণ করেন বলিয়া ভর্ত্তা। অতএব আমার শক্তু দান করুন। আপনি স্বয়ং জরাপরিগত বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, দুর্ব্বল এবং উপবাসপরিশ্রান্ত; আপনারও শক্তু দান করিয়াছেন।' এই কথায় সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সে শক্তু লইয়াও অতিথিকে বলি-

লেন, যে, 'হে ব্রহ্মন্! এ শক্তুও আপনি পুনশ্চ গ্রহণ করুন।' অতিথি তাহা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিলেন। কিন্তু পরিতুষ্ট হইলেন না। তাহা দেখিয়া উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ চিন্তাপর হইলেন।

"তখন তাঁহার পুত্র বলিলেন,—'মহাশয়! আমারও শক্তু গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। আমি ইহা পুণ্য জ্ঞান করি, এজন্য এরূপ করিতেছি। আপনি সর্ব্বদা যত্নের সহিত আমার পরিপাল্য। বৃদ্ধ পিতার পালন সাধু ব্যক্তিগণ কামনা করিয়া থাকেন। বার্দ্ধক্যে পিতার পরিপালন পুত্রের বিহিত কর্ম্ম, ইহাই ত্রিলোকে চির-প্রসিদ্ধা শ্রুতি।'

"তাঁহার পিতা বলিলেন, 'তোমার সহস্র বৎসর বয়স হইলেও তুমি আমার কাছে বালক। বালকদিগের ক্ষুধা অতিশয় বলবতী হয়, ইহা আমি জানি। আমি বৃদ্ধ, ক্ষুধা সহ্য করিব। বৎস! তুমি বলবান্ হও। আমার প্রাচীন বয়স, এজন্য ক্ষুধা আমাকে পীড়িত করিতে পারে না। আর দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছি, এজন্য মরণকেও ভয় করি না।' তখন ব্রাহ্মণকুমার বলিল, 'আমি আপনার পুত্র। ইহাই শ্রুতি যে, পুত্র, রক্ষা করে বলিয়াই পুত্র। আপনিই পুত্র, ইহা স্মৃতি। অতএব আপনি আপনার দ্বারাই আপনাকে রক্ষা করুন।' তখন তাঁহার পিতা বলিলেন, 'হে পুত্র! রূপে তুমি আমার সদৃশ এবং শীলে ও দমেও বটে। তোমাকে বহুধা পরীক্ষা করিয়াছি, অতএব তোমার শক্তু আমি গ্রহণ করিলাম।' ইহা বলিয়া, প্রীতমনে সেই দ্বিজসত্তম পুত্রের শক্তু লইয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে সহাস্যে প্রদান করিলেন। সে শক্তু ভোজন করিয়াও অতিথি তুষ্ট হইলেন না। ধর্ম্মাত্মা উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইলেন। তখন তাঁহার সাধ্বী পুত্রবধূ ব্রাহ্মণের হিতকামনা করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক আপনার শক্তু শ্বশুরকে দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার এই শক্তু লইয়া অতিথিকে প্রদান করুন। আপনার প্রসাদে আমার অক্ষয়লোকপ্রাপ্তি হইবে।'

"তাঁহার শ্বশুর উত্তর করিলেন,—'তোমাকে বাতাতপশীর্ণাঙ্গী, বিবর্ণা এবং স্বব্রতাচারে কৃশা ও ক্ষুধাবিহ্বলচেতসা দেখিতেছি। অতএব তোমার শক্তু আমি কি প্রকারে গ্রহণ করিব? তাহা করিলে, আমি ধর্ম্মোপঘাতক হইব। অতএব হে কল্যাণি! তুমি আর কিছু বলিও না। তুমি শৌচশীলতপোন্বিতা, কৃচ্ছ্রবৃত্তি এবং ষষ্ঠকালীন ভোজন-ব্রতচারিণী; তোমাকে নিরাহারে থাকিতে কি প্রকারে দেখিব? তুমি

বালিকা, এবং ক্ষুধার্ত্তা নারী, উপবাসে পরিশ্রান্তা এবং কুটুম্বকন্যা। অতএব তুমি আমার সতত রক্ষণীয়া।' স্নুষা বলিল, 'আপনি আমার গুরুর গুরু, দেবতার দেবতা, দেবাতিদেব। অতএব হে প্রভু! আমার শক্তু গ্রহণ করুন। দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম গুরুশুশ্রূষার্থ। এবং আপনার প্রসাদে আমার শুভলোকপ্রাপ্তি হইবে। আমাকে দৃঢ়ভক্তিমতী জানিয়া, অথবা আমি আপনারই, ইহা জানিয়া, আমার শক্তু গ্রহণ করুন।'

"তখন শ্বশুর বলিলেন, '(তুমি এই শীলবৃত্তের দ্বারা নিত্য সাধ্বী-স্বরূপা প্রতিপন্না হইয়া থাক।) তুমি ধর্ম্মপরায়ণা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমতী। অতএব হে মহাভাগে! তোমাকে ধর্ম্মপরায়ণাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তোমার শক্তু গ্রহণ করিব। তুমি বঞ্চনার যোগ্যা নহ।' ইহা বলিয়া, ব্রাহ্মণ তাঁহার শক্তু লইয়া অতিথিকে প্রদান করিলেন। তাহাতে তিনিও সন্তুষ্ট হইলেন। সেই অতিথি ব্রাহ্মণ স্বয়ং পুরুষরূপধারী ধর্ম্ম। তিনি বাগ্মিতার সহিত দ্বিজশ্রেষ্ঠকে প্রীতমনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। 'হে দ্বিজসত্তম! তোমার ন্যায়োপার্জ্জিত পবিত্র ধর্ম্মতঃ যথাশক্তি দানে আমি প্রীত হইয়াছি। তোমার এই দান স্বর্গে স্বর্গনিবাসিগণ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইতেছে। ঐ দেখ, গগন হইতে পুষ্পবৃষ্টি ভূতলে পতিত হইতেছে। দেবর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ এবং দেবপুরঃসর দেবদূতগণ তোমার এই দানে বিস্মিত হইয়া তোমার স্তব করিতেছেন। ব্রহ্মলোকচারী ব্রহ্মর্ষিগণ বিমানস্থ হইয়া তোমার দর্শনকামনা করিতেছেন। হে দ্বিজর্ষভ! তুমি স্বর্গে গমন কর। পিতৃলোকগত তোমার পিতৃগণকে তুমি তারিত করিলে। তুমি ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজ্ঞ, তপস্যা, অবিমিশ্র ধর্ম্মে বহুযুগাতিপাত করিয়াছ। অতএব তুমি স্বর্গে গমন কর। হে সুব্রত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তোমার পরাশ্রদ্ধাযুক্ততপস্যায় এবং দানে দেবগণ প্রীত হইয়াছেন। তুমি এই কৃচ্ছ্রকালে বিশুদ্ধচিত্তে যে দান করিয়াছ, তাহাতে স্বর্গ বিজিত হইয়াছে। ক্ষুধাতে প্রজ্ঞা নষ্ট করে, ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। যাহার জ্ঞান ক্ষুধাতে নষ্ট হইয়াছে, তাহার ধৈর্য্যও থাকে না। যে বুভুক্ষাকে জয় করে, সে নিশ্চিত স্বর্গ জয় করে। যেখানে দানপ্রবৃত্তি থাকে, সেখানে ধর্ম্ম কখনও অবসন্ন হয় না। তুমি সুতস্নেহ বা কলত্রস্নেহের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, ধর্ম্মই গুরু বিবেচনা করিয়া, তৃষ্ণাকে গণনা করিলে না। মনুষ্যের দ্রব্যার্জ্জন সূক্ষ্ম ব্যাপার। উপযুক্ত পাত্রে

দান করা, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। উপযুক্ত কালে দান, তাহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রদ্ধাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বর্গদ্বার অতি সূক্ষ্ম। মনুষ্য মোহবশতঃ তাহা দেখিতে পায় না। লোভবীজ তাহার অর্গলস্বরূপ। ক্রোধ কর্তৃক তাহা রক্ষিত। অতএব তাহা অতি দুরাসদ। যে পুরুষেরা জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, যোগযুক্ত, তপস্বী, ব্রাহ্মণ, এবং যাঁহারা যথাশক্তি দান করেন, তাঁহারাই তাহা দেখিতে পান। যাঁহার শক্তি সহস্র পরিমিত, তিনি শত দান করিলে যে ফল হয়, যাঁহার শক্তি শত পরিমিত, তিনি দশ দান করিলেই সেই ফল হয়। শক্তি অনুসারে কেবল জল দান করিলেও সেই ফল হয়। রন্তিদেব নামে রাজা দরিদ্রাবস্থায় শুদ্ধচিত্তে কেবল একটু জল দান করিয়াই স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। হে বৎস! মহামূল্য দানে ধর্ম্ম প্রীত হন না, ন্যায়লব্ধ সামান্য বস্তু শ্রদ্ধাপূতচিত্তে দান করিলে, সন্তুষ্ট হন। নৃগ রাজা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গো দান করিয়াও, একটি পরকীয় গো দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নরকগমন হইয়াছিল। উশীনরপুত্র শিবি রাজা আত্মমাংস দান করিয়া পুণ্যবান্‌গণের প্রাপ্য যে লোক তাহা লাভ করিয়া আনন্দভোগ করিতেছেন। ঐশ্বর্য্য মনুষ্যের পুণ্যের কারণ নহে। সজ্জনগণ আপনার শক্তিতে যাহা সদুপায়ে উপার্জ্জন করেন, বিবিধ যজ্ঞ সেই ন্যায়লব্ধ ধনের তুল্য পুণ্যের কারণ নহে। ক্রোধ দানফল নষ্ট করে। লোভ থাকিলে কেহ স্বর্গে যাইতে পারে না। ন্যায়বৃত্তি দ্বারাই দানবিৎ স্বর্গ প্রাপ্ত হন। বিপুলদক্ষিণাযুক্ত বহুতর রাজসূয় যজ্ঞ, অথবা বহুতর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল তোমার এই কার্য্যের তুল্য নহে। তুমি এই শক্তুপ্রস্থের দ্বারা অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ। অতএব হে বিপ্র! তুমি সুখে নির্ম্মল ব্রহ্মভবনে গমন কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমাদের সকলের জন্য দিব্যযান উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা যথাভিলাষ আরোহণ কর। আমি ধর্ম্ম, আমাকে দর্শন কর। তুমি দেহের উদ্ধার করিয়াছ। ইহলোকে তোমার কীর্ত্তি স্থিরা থাকিবে। ভার্য্যা, পুত্র, পুত্রবধূ সঙ্গে তুমি স্বর্গে গমন কর।'

"ধর্ম্ম এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ, ভার্য্যা পুত্র ও স্নুষার সহিত দিব্যযানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, দারা পুত্র ও পুত্রবধূ সহিত স্বর্গে গমন করিলে, আমি গর্ত্তের ভিতর হইতে বাহির হইলাম। সেই শক্তুর গন্ধে, ক্লেদে ও জলে এবং সাধুর দানলব্ধ দিব্যপুষ্পের বিমর্দ্দে এবং সেই ব্রাহ্মণের তপস্যাফলে, আমার

শিরোদেশ কাঞ্চনময় হইল। এবং সেই সত্যাভিসন্ধ ব্রাহ্মণের শক্তু-দানে আমার শরীরার্দ্ধও স্বর্ণময় হইল। হে বিপ্রগণ! তোমরা তাঁহার সেই বিপুল তপস্যার ফল এই দর্শন করিতেছ! এক্ষণে আমার অন্য পার্শ্ব কি প্রকারে এইরূপ হইবে, তাহার জন্য আমি তপোবন সকল ও যজ্ঞ সকল দেখিয়া বেড়াইতেছি। ধীমান্ কুরুরাজের এই যজ্ঞের কথা শ্রবণ করিয়া আমার বিস্তর আশা হইয়াছিল। কিন্তু কই, আমি ত কাঞ্চনীকৃত হইলাম না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি তাই হাসিয়া বলিতেছিলাম, যে এই যজ্ঞ কোন প্রকারেই সেই শক্তুপ্রস্থের তুল্য নহে। আমি সেই শক্তুপ্রস্থের কণায় কাঞ্চনীকৃত হইয়াছিলাম, অতএব আমার বিবেচনায় এই মহাযজ্ঞ তাহার তুল্য নহে।" ব্রাহ্মণ-গণকে এই কথা বলিয়া নকুল অদর্শন হইল। ব্রাহ্মণেরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।*

[মহাভারত।

তপোবন।

অতি পূর্ব্ব কালে, ভারতবর্ষে, দুষ্যন্ত নামে সম্রাট ছিলেন। তিনি, একদা, বহুতর সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। এক দিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে দ্রুত বেগে, পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, মৃগের পশ্চাৎ রথচালন কর। সারথি কশাঘাত করিবা-মাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎ ক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, দূর হইতে, দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে

* This extract has been specially translated, occasionally freely, by the compiler for the present compilation. A few words and phrases, and even entire verses, have been here and there purposely omitted.

লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি, শুনিয়া, অবলোকন করিয়া কহিল, মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রাজা, তপস্বীর উল্লেখশ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া, রথের বেগ সংবরণ কর। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল।

3 এই অবকাশে, তপস্বীরা, রথের সন্নিহিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে। শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনকার শস্ত্র আর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধীকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।

4 রাজা, লজ্জিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ, সংহিত শরের প্রতিসংহরণ পূর্ব্বক, প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনকার এই বিনয় ও সৌজন্য তদুপযুক্তই বটে। প্রার্থনা করি, আপনকার পুত্রলাভ হউক, এবং সেই পুত্র এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হউন। রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।

5 অনন্তর, তাপসেরা কহিলেন, মহারাজ! ঐ মালিনী নদীর তীরে, আমাদের গুরু মহর্ষি কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে; যদি কার্য্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথিসৎকার স্বীকার করুন। আর, তপস্বীরা, কেমন নির্ব্বিঘ্নে, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, বুঝিতে পারিবেন, আপনকার ভুজবলে, ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত হইতেছে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, মহর্ষি আশ্রমে আছেন? তপস্বীরা কহিলেন, না মহারাজ! তিনি আশ্রমে নাই; এই মাত্র, স্বীয় তনয়া শকুন্তলার হস্তে অতিথিসৎকারের ভারার্পণ করিয়া, তদীয় দুর্দৈবশান্তির নিমিত্ত, সোমতীর্থে প্রস্থান করিলেন। রাজা কহিলেন, মহর্ষি আশ্রমে নাই, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আমি, অবিলম্বে, তদীয় তপোবন দর্শন করিয়া, আত্মাকে পবিত্র করিতেছি। তখন তাপসেরা, এক্ষণে আমরা চলিলাম, এই বলিয়া, প্রস্থান করিলেন।

6 রাজা সারথিকে কহিলেন, সূত! রথচালন কর, তপোবনদর্শন

দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিব; সারথি, ভূপতির আদেশ পাইয়া, পুনর্ব্বার রথচালন করিল। রাজা কিয়ৎ দূর গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, সূত! কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদীফল ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ, কুশভূমিতে হরিণশিশু সকল, নিঃশঙ্ক চিত্তে, চরিয়া বেড়াইতেছে; এবং যজ্ঞীয় ধূমের সমাগমে, নব পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। সারথি কহিল, মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন।

রাজা, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, সারথিকে কহিলেন, সূত! আশ্রমের উৎপীড়ন হওয়া উচিত নহে; অতএব, এই খানেই রথ রাখ, আমি অবতীর্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত করিল। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর, তিনি স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সূত! তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য; অতএব, শরাসন ও সমুদয় আভরণ রাখ। এই বলিয়া রাজা সেই সমস্ত সূতহস্তে ন্যস্ত করিলেন, এবং কহিলেন, অশ্বগণের আজ অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব, আশ্রমবাসীদিগের দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, উহাদিগকে ভাল করিয়া বিশ্রাম করাও। সারথিকে এই আদেশ দিয়া, রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনে প্রবেশ করিবা মাত্র, তদীয় দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা, তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই আশ্রমপদ শান্তরসাস্পদ, অথচ আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদনুযায়ী ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়। অথবা, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই হইতে পারে। মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, প্রিয়সখি! এ দিকে, এ দিকে; এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণাংশে, যেন স্ত্রীলোকের আলাপ শুনা যাইতেছে; কি বৃত্তান্ত, অনুসন্ধান করিতে হইল।

এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, রাজা দেখিতে পাইলেন, তিনটি অল্পবয়স্কা তপস্বিকন্যা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আসিতেছেন। রাজা, তাঁহাদের রূপের মাধুরী

দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, ইহারা আশ্রমবাসিনী; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্য্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল। এই বলিয়া, তরুতলে দণ্ডায়মান হইয়া, রাজা, অনিমিষ নয়নে, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সহচরীর সহিত, বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া, পরিহাস করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে! বোধ করি, তাত কণ্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকাকুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই, জলসেচন করিতে আসিয়াছি, এমন নয়; আমারও ইহাদের উপর সহোদরস্নেহ আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয়, তাহাদের সেচন সমাপ্ত হইল; এক্ষণে, যাহাদের কুসুমের সময় অতীত হইয়াছে, আইস, তাহাদিগের সেচন করি। অনন্তর, সকলে মিলিয়া, সেই সমস্ত বৃক্ষে জলসেচন করিতে লাগিলেন।

রাজা দেখিয়া শুনিয়া, প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক; এমন শরীরে, কেমন করিয়া, বল্কল পরাইয়াছেন। অথবা যেমন, প্রফুল্ল কমল, শৈবলযোগেও, বিলক্ষণ শোভা পায়; যেমন পূর্ণ শশধর, কলঙ্কসম্পর্কেও, সাতিশয় শোভমান হয়; সেইরূপ, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বল্কল পরিধান করিয়াও, যার পর নাই মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, তাহাদের কি না অলঙ্কারের কার্য্য করে।

শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে, সম্মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! দেখ দেখ, সমীরণভরে, সহকারতরুর নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সহকার, অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা, আমায় আহ্বান করিতেছে; অতএব, আমি উহার নিকটে চলিলাম! এই বলিয়া, তিনি, সহকারতরুতলে গিয়া, দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন,

সখি! ঐ খানে খানিক থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, কেন সখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন, তুমি সমীপবর্ত্তিনী হওয়াতে, যেন সহকারতরু অতিমুক্তলতার সহিত সমাগত হইল। শকুন্তলা, শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! এই জন্যেই, তোমায় সকলে প্রিয়ংবদা বলে।

অনসূয়া কহিলেন, শকুন্তলে! দেখ দেখ, তুমি যে নবমালিকার বনতোষিণী নাম রাখিয়াছ, সে, স্বয়ংবরা হইয়া, সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, বনতোষিণীর নিকটে গিয়া, সহর্ষ মনে কহিতে লাগিলেন, সখি অনসূয়ে! দেখ, ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত; নবমালিকা, বিকসিত নব কুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে; আর, সহকারও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে, প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন, অনসূয়ে! কি জন্যে শকুন্তলা, সর্ব্বদাই, বনতোষিণীকে উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান? অনসূয়া কহিলেন, না সখি! জানি না; কি বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই মনে করিয়া, যে, বনতোষিণী যেমন সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন, সেইরূপ, আপন অনুরূপ বর পাই। শকুন্তলা কহিলেন, এটি তোমার আপনার মনের কথা।

শকুন্তলা, এই বলিয়া, অনতিদূরবর্ত্তিনী মাধবীলতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, হৃষ্ট মনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! তোমায় এক প্রিয় সংবাদ দি, মাধবীলতার, মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত, মুকুল নির্গত হইয়াছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! আমিও তোমায় এক প্রিয় সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শিত করিয়া, কহিলেন, এ তোমার মনগড়া কথা, আমি শুনিতে চাই না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, না সখি! আমি পরিহাস করিতেছি না। পিতার মুখে শুনিয়াছি, তাই বলিতেছি, মাধবীলতার এই যে মুকুল নির্গম, এ তোমারই শুভসূচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া, অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রিয়ংবদে! এই জন্যেই, শকুন্তলা মাধবীলতায়, এতাদৃশ যত্ন সহকারে, জলসেচন ও উহার প্রতি এতাদৃশ স্নেহপ্রদর্শন করে। শকুন্তলা কহিলেন, সে জন্যে ত নয়; মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত, উহাকে সতত সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি। এই বলিয়া, শকুন্তলা মাধবীলতায় জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন। [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শকুন্তলার বিদায়।

মহর্ষি কণ্ব এই রূপে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার অগোচরে, ও সম্মতি ব্যতিরেকে, সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না; বরং, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে, শকুন্তলা এতাদৃশ সৎ পাত্রের হস্তগতা হইয়াছে। অনন্তর তিনি, প্রফুল্ল বদনে, শকুন্তলার নিকটে গিয়া, সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং স্থির করিয়াছি, অবিলম্বে, দুই শিষ্য ও গৌতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমায় পতিসন্নিধানে পাঠাইয়া দিব। অনন্তর, তদীয় আদেশক্রমে, শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী, এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, যথাসম্ভব, বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি, শোকাকুল হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপুরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া, বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহ বশতঃ, আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি, সংসারীরা, এমন অবস্থায়, কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। অনন্তর, তিনি, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর; আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া, তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি, তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি, ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহ বশতঃ, কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে

প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত, আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু; তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে, আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে; তোমার বিরহে, তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ!—জীব মাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ, আহারবিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী, নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ, আম্র-মুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া, নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে, ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া, যাইব না। এই বলিয়া, তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বন-তোষিণি! শাখাবাহু দ্বারা, আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করি-লাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল? এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল? কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে; এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে, তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে; যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে, তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন

হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও; আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে, আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর, পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া, শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগের সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল; উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে, বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া, প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে, সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে—আমরা বনবাসী, তপস্যায় কাল-যাপন করি; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর, শকুন্তলা, বন্ধুবর্গের অগোচরে, স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে; আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নী-দিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্যপ্রদর্শন করিলেও, রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না; মহিলারা, এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই, গৃহিণীপদে প্রতি-ষ্ঠিতা হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কন্টকস্বরূপ। ইহা কহিয়া, বলিলেন, দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন? গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে

এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা! উনি যে গুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।

এই রূপে উপদেশদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না; আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও কি এই খান হইতে ফিরিয়া যাইবেক? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব, সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন। শকুন্তলা, পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, গদ্গদ স্বরে কহিলেন, তাত! তোমায় না দেখিয়া, সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। এই বলিতে বলিতে, তাঁহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, বৎসে! এত কাতর হইতেছ কেন? তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, তাত! আবার, কত দিনে, এই তপোবনে আসিব? কণ্ব কহিলেন, বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া, এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত, ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতি সমভিব্যাহারে, পুনরায়, এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া, গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার বেলা বহিয়া যায়; সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া লও; আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদের নিকটে গিয়া কহিলেন, সখি! তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা, শুনিয়া, অতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল? তোমাদের কথা শুনিয়া, আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন, না সখি! ভীত হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, সকলের নিকট বিদায় লইয়া, শকুন্তলা, গৌতমী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দুষ্যন্তরাজধানী উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া, ও প্রিয়ংবদা, এক দৃষ্টিতে, শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে, শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন; এক্ষণে, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া, মহর্ষি আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে, মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পিত হইলে, লোক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়; তদ্রূপ, অদ্য আমি, শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম।

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

স্বপ্নদর্শন—বিদ্যা-বিষয়ক।

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতুহলী হইয়া আমি কিয়ৎকালাবধি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানা স্থান পর্য্যটনপূর্ব্বক এখন মথুরাসন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয়প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্ব্বক সুললিত লহরীলীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক-খণ্ড গগন-মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ-বিকীরণ-পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ-বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত

রশ্মি-জাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগনালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি অন্ত, কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে-ছিলাম। ইতিমধ্যে জল-কল্লোলের কল কল ধ্বনি, বৃক্ষ-পত্রের শর শর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোনও স্থানে কেবল নবীনদূর্ব্বাদলপরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝরতীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া, যত দূর দৃষ্ট হইল, তত দূরই মহোৎসাহে ও পরমসুখে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।

অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড় নির্জ্জন নিস্তব্ধ বন-খণ্ডে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক শান্তস্বভাব অবলোকনে তাঁহাকে বন-দেবতা জ্ঞান করিয়া বিহিত-বিধানে নমস্কার করিলাম ও তাঁহার পুনঃপুনঃ দর্শনলাভ দ্বারা নয়নযুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতা-ঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোল-প্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বাক্যস্ফূরণ না হইতেই, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় আগ্রহ-প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি তোমার মানস জানিয়াছি, আমার নাম বিদ্যা, তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহার এই

পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই রম্য কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি ; চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।”

আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া হৃষ্টমনে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয়-পার্শ্ব-বর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে অরণ্যের শৈত্য, শোভা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া অতুলানন্দ প্রাপ্ত হইলাম এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “দেবি ! এ স্থানের নাম কি এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে ?” তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া উত্তর করিলেন, “এ বিদ্যারণ্য, এ অরণ্যে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন ; কিন্তু ইহার ফলভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনমাত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল আহরণের প্রত্যাশায় কতক দূর বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই রমণীয় কাননের ফলভোগ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি তাহার আস্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন না। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদায় দর্শাইতেছি, চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা সমুদায় সুমধুর রসস্ফীত ফলভরে অবনত হইয়াছে, যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধু-ধারা সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে ও সুকুমার-মতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্য-তরু। দেখিয়াছ, অলঙ্কৃতিরূপা কি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রমণীয় লতা তাহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধীর প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ।” ইহা কহিয়া বিদ্যাদেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাক্যাবসান হইলে, আমি জ্যোতিষ-তরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত সমুদায় এক এক বার প্রগাঢ়রূপ মনোনিবেশপূর্ব্বক ধ্যান-পরায়ণ হইতেছেন, আর বার প্রসন্নবদনে হাস্য করিয়া অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা-

সংযুক্ত নহে, আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত তরুর ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ আর একটীও দৃষ্টি করি নাই। তাহার কোনও স্থানের কণামাত্রও ক্ষয় হয় নাই ও কুত্রাপি একটী মাত্র ছিদ্র কিংবা চিহ্ন নাই। আমি এই অদ্ভুত তরুর বিষয় সবিশেষ জানিবার জন্য পরম কৌতুহলী হইয়া বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, "এই সারবান্ অক্ষয় বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তী জ্যোতিষ-তরুর মূল ইহাতে সম্বদ্ধ দেখিতেছ, প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তদুপরি প্রতিষ্ঠিত আছে।" বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে; শাখা প্রশাখা ও বৃক্ষরুহ-সংবলিত এক গণিত-বৃক্ষ অর্দ্ধ কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ-প্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহবচনে বলিলেন, "সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষ-লতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কয়েকটা কলম তোমাদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্ন জাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া উৎসাহ ও যত্নসহকারে তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতিসাধন করিয়াছে! আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়, কারণ যতগুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক-জাতীয়, তাহার নাম স্মৃতি; আর বাম দিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।" আমি ঐ উভয়-জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। ঐ সমস্ত সহজেই অসার রন্ধ্রপরিপূর্ণ, কোনটা বা নিতান্ত শূন্যগর্ভ, তাহাতে আবার সমুচিত যত্নসহকারে পরিপালিত না হওয়াতে অতিশয় দুরবস্থ হইয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, দক্ষিণ দিকের সমুদায় বৃক্ষ যদিও সম্যক্-রূপে নষ্ট হয় নাই; কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্নশাখ হইয়াছে, কিন্তু পারিপাট্য নাই; বোধ হইল, যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা সমুদায় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বামদিকের কোনও বৃক্ষের কেবল স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটার বা সমুদায় গিয়া এক দিকের একমাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম; কতকগুলি অভিমানী

মনুষ্য উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা সহকারে মহাকোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরু সমূহ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম এবং অতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যাদেবীকে কহিলাম, "দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখ লাভ করিলাম। ভূমণ্ডলে এমত নির্ম্মল সুখ-ধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, এ স্থানে বিশুদ্ধচিত্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।" এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিষণ্নবদনে কহিলেন, "তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, এ স্থান ধর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তত্ত্ব-পরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য্য সকলেই এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে; পাপ-রূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট-স্থান হইয়া উঠিয়াছে। (ঐ দেখ, বিজাতীয়বেশধারী অভিমান, স্বমস্তক উন্নত ও গ্রীবা-দেশ বক্র করিয়া, অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাশ্লাঘাপ্রকাশপূর্ব্বক সগর্ব্ব পাদ বিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না, যে উহারা মনে মনে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে! তৎ-পার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উনি অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কেহ অভিমানকে স্পর্শমাত্র করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার বৈর-নির্যাতন করিতে উদ্যত হয়।) এদিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। এক্ষণে ও যেরূপ স্থূলকায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে, বিশ্ব-সংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি জান?—লোভ। বিশেষতঃ কাব্য-তরু-তলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচারে এ স্থানের অতিশয় অপযশ-ঘোষণা হইয়াছে; উহাদের নাম কাম ও পান-দোষ। এককালে এই অপূর্ব্ব আনন্দ-কাননে নিষ্কলঙ্ক দম্পতি-প্রেমেরই প্রাদুর্ভাব ছিল; তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, কোন দুষ্ক্রিয়া এ স্থানে

প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইত না। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দম্পতি-প্রেম ও তাঁহার সহচরদিগের দৈন্যদশা উপস্থিত হইয়া পরানুরাগী কামরূপ পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইতেছে। অবলোকন কর, পান-দোষ আপনার দল বল সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে! কি বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে! দেখ দেখ, তাহার ভয়ে ধর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে আর কতকগুলি দুর্দ্দান্ত পিশাচ পিশাচী আসিয়া তাহার সহিত বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে প্রিয়তম! এমত পরিশুদ্ধ পুণ্য-ধামের এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা এই সমস্ত রাক্ষস পিশাচকে আশ্রয় দেয়, তাহারা তদ্দ্বারা আমাকেই প্রহার করে। আমি এ অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া স্বয়ং এরূপ ভূরি ভূরি অপ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব? ঐ ঘনপল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরমা সুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার পর কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল কতকগুলি বেশ-ভূষা-কল্পনা দ্বারা তৎসমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে। উহার নাম কপটতা।”

সমুদায় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম, এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোকদুঃখেতেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই একটি সুখময় পুণ্যধাম ছিল, তাহাতে এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে! যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদুঃখনিবারিণী সন্তাপনাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর এক বার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে সকল রাক্ষস পিশাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বিশেষতঃ কাম ও পানদোষ এই দুই জন নানাবিধ সুমধুর প্ররোচনা-বাক্য বলিয়া আমাকে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহাদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, তখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয়, এই আশঙ্কায় পরমহিতৈষিণী বিদ্যাদেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় দিয়া ধৈর্য্য ও

তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল-পরাক্রান্ত প্রহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা দুই জনে ইহাঁর দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহাঁর নিকটস্থ হইতে না পারে।"

এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্নবদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান; ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম-পুলকিত-চিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত-ফল-প্রত্যাশায় মহোৎসাহ-সহকারে দ্রুত-বেগে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিলম্বে পর্ব্বত-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রত সুশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহু-পরিশ্রমী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহারা যাত্রীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, আর পুরুষের নাম যত্ন।

ঐ পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতি কষ্টে কিছু দূর গমন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম, সম্প্রতি এই স্থানেই অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয় মহীয়সী শক্তি দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন, "হে প্রিয়তম! এ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান—সাবধান।" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে, যত আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি* উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল। তথাকার সুশীতল-মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য অত্যাচার এ সকলের কিছু নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্ব-সংসারে এমন রম্যস্থান আর

* ধর্ম্মাচলের উপর।

দ্বিতীয় নাই। কিছু কাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতুহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, কতকগুলি পরম-পবিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহা-দিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী, এবং সারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনল-ঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন আনন্দপ্রতিমা-গুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইহাঁরা দেব-কন্যা হইবেন, তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা-পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, ইহাঁরা দেব-কন্যাই বটেন এবং এই ধর্ম্মাচল ইহাঁদের বাসভূমি। ইহাঁদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি। সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইহাঁদের রূপ ভুবন-বিখ্যাত। ইহাঁরা যে পর্য্যন্ত সুশীল তাহা কি বলিব। বিদ্যারণ্যযাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহাদিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও জীবন পবিত্র কর।

বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে আমি উল্লিখিত শান্তি-সরোবরে অব-গাহন করিয়া অভূত-পূর্ব্ব অতি নির্ম্মল আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুন্দর-মারুত-সেবিত যমুনাকূলেই শয়িত রহিয়াছি।

[অক্ষয়কুমার দত্ত।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান।

এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান গৃহে ও বাহিরে একভাবে ছিল। বেদেতে, মনুতে ও পুরাণে স্ত্রীলোকদিগের সম্মানের প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মনু বলেন, স্ত্রীলোক যথার্থ পবিত্র। স্ত্রীলোক ও লক্ষ্মী, সমান। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি

অনুরক্ত, সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমানা। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই শুদ্ধ। যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান, সেখানে দেবতারা তুষ্ট। যে স্থানে স্ত্রীলোক অসম্মানিত, সেখানে সকল ধর্ম্মের ভ্রষ্টতা।

বিবাহিত স্ত্রীলোক পিতা কর্ত্তৃক, ভ্রাতা কর্ত্তৃক, স্বামী কর্ত্তৃক ও দেবর, ভাশুর কর্ত্তৃক, সম্মানিত ও পূজিত হওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোক "ভবতি ও প্রিয় ভগ্নী বা মাতা" বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। স্ত্রীলোক দেখিবামাত্রে পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অগ্রে যাইতে দিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির আপন কিঙ্করীকে "ভদ্রে" বলিয়া ডাকিতেন। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত। অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক, নিষেধিত না হইলে, কথোপকথন করিতে পারিত। কিন্তু স্বামী বিদেশে গমন করিলে, স্ত্রী অন্যের বাটীতে উৎসব ও যেখানে বহু-লোকের সমাগম, সেই সকল স্থানে না যাইয়া আপন গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজারা স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। ভরত, রামচন্দ্রের নিকট বনে গমন করিলে, রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান-পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকতো ?" যখন যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাজ্যেতে দুঃখিনী অঙ্গনারা তো উত্তমরূপে রক্ষিত হয় ও রাজবাটীতে স্ত্রীলোকেরা তো সম্মান-পূর্ব্বক গৃহীত হয় ?" স্ত্রীলোক, রক্ষকবিহীনা হইলে রাজা দ্বারা রক্ষিত হইতেন। মনু কহেন, "কন্যা অতিশয় স্নেহের পাত্রী।" ভীষ্ম কহেন—মাতা ইহ ও পরলোকের মঙ্গলকারিণী। পীড়িত ও দুঃখিত স্বামীর স্ত্রী অপেক্ষা রত্ন নাই। স্ত্রী পরম ঔষধ; আধ্যাত্মিকতা অর্জ্জনে স্ত্রী অপেক্ষা সহযোগিনী নাই। মনু ও রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক আপন শুদ্ধমতিতেই রক্ষিত হয়, বদ্ধ থাকিলে রক্ষিত হয় না। কথাসরিৎসাগরে এক গল্পে লেখে যে, যখন এক বরকন্যা বিবাহ করিয়া আইলেন, কন্যা কহিলেন—দ্বার উদ্ঘাটন কর, বন্ধুবান্ধবের সমাগম হউক। স্ত্রীলোক অন্তর্ব্বলেতেই রক্ষিত হয়। বন্ধনের আবশ্যকতা নাই। ডাক্তর উইল্‌সন্ আমাদিগের ভাষা ও শাস্ত্র উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দুজাতীয় মহিলাগণ যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, এরূপ আর কোন প্রাচীন জাতিতে হয় নাই। স্ত্রীলোক, সকল নাটকে কবিতাতে উৎকৃষ্ট ও উচ্চ-রূপে বর্ণিত। তাহারা পুরুষদিগের নিয়ামক ও পুরুষেরাও তাহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিত। [প্যারীচাঁদ মিত্র।

অর্থসঞ্চয়।

আমাদিগের দেশ বড়ই দরিদ্র। ইহা যে কত দরিদ্র, তাহা অনেকেই মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারেন না। 'উনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে,' 'দেশের উন্নতি হইতেছে' ইংরাজদিগের এই সকল কথা পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়া কৃতবিদ্যেরা শুকপক্ষীর ন্যায় ঐ শব্দগুলির উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছেন। 'উনবিংশ শতাব্দী'ও ইংরাজের—'উন্নতি'ও ইংরাজের; ঐ সকল উক্তির সহিত তোমার আমার কোন সম্পর্কই নাই। যত কাল যায়, সকল জাতীয়েরই উন্নতি হয়, ইতিহাস এমন কথা বলে না। যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে বালকের দেহ পুষ্ট হইতে থাকে বটে, কিন্তু বর্ষীয়ান্‌দিগের তাহা হয় না—তেমনি ইংরাজের উন্নতি উনবিংশ-শতাব্দীতে হইতেছে বলিয়া আমাদিগেরও সে উন্নতি হইতেছে না—আমাদের অবনতিই হইতেছে।

সমাজের অবনতির চিহ্ন অনেকগুলি*—এবং সকলগুলিই দারিদ্র্যের সূচক। অতএব এক দারিদ্র্যকেই অবনতির লক্ষণ বলিয়া ধরা যায়; পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৮৮০ অব্দে ব্রিটন দ্বীপে প্রতি ব্যক্তির গড়ে বার্ষিক আয় ৩৩০, ফ্রান্সে ২৯০, পর্টুগালে ৮০, তুরস্কে ৪০, এবং ভারতবর্ষে ২৭ টাকা বই নয়। ঐ সকল দেশের মধ্যে কোন-টীর সম্বন্ধেই এমন কথা কেহ বলেন না যে, সেখানকার লোকেরা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, এখানকার ৫ কোটী লোক, অর্থাৎ সমস্ত জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করে।

এই বুভুক্ষাপীড়িত নিরন্ন দেশে দানধর্ম্মের বড়ই সমাদর। এখানকার লোকেরা যেন শুষ্ককণ্ঠ চাতকপক্ষীর ন্যায় সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বিন্দু-পাতের প্রত্যাশা করিয়া থাকে এবং কথঞ্চিৎ কোথা হইতে কণামাত্র প্রাপ্ত হইলেই আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠে। এ দেশে দানধর্ম্মের যে এতটা প্রশংসা, তাহার কতকটা ঐ চাতকপক্ষীদিগের সহর্ষ কল কল ধ্বনি।

কিন্তু সকলটা তাহাই নয়। এতদ্দেশীয় জনগণের প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবও

---

* জন্মসংস্কারবিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায়কর্ম্মণঃ।
হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাং॥

ঐ প্রশংসার কতক কারণ। এ দেশের লোকের হৃদয়ে পরকালে শ্রদ্ধা এত দৃঢ় যে, ইহাঁরা ইহলৌকিক কার্য্যকলাপকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরই জ্ঞান করিয়া থাকেন। পৃথিবী ত চিরকালের বাসভূমি নয়—সাংসারিক সুখ দুঃখ ত অধিক কাল স্থায়ী হয় না—অতএব পার্থিব বিভব সঞ্চয় করিতে গিয়া অনর্থ কষ্ট পাইবার আবশ্যক কি? যদি কাহারও দান করিবার ক্ষমতা হইয়া থাকে, সে হাতের সুখে এবং মনের আনন্দে দান করিয়া লউক; লোকে যশ গাহিবে, পরকালেও দিব্য গতি হইবে; যকের ন্যায় টাকার পুঁটুলি চৌকী দিয়া কি জন্য থাকিব? চক্ষু মুদিলে ত কেহ কাহার নয়—কোথায় বা পুত্র—কোথায় বা কলত্র!

তবে কি আর্য্যজাতীয়দিগের মধ্যে পারিবারিক স্নেহ মমতা অন্যান্য জাতীয়দিগের অপেক্ষা ন্যূন? তাহা ত কোন ক্রমেই নহে। তবে সেই স্নেহ মমতা বিবেচনার দোষে পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকারী হইতে পায় না। যেমন "লাইফ্ ইনস্যুর" করা থাকিলে, কাহার কাহার মিতব্যয়িতা কমিয়া যায়, সম্মিলিত পরিবারের মধ্যে বাসনিবন্ধন আমাদিগেরও এক প্রকার "লাইফ্ ইনস্যুর" হইয়া থাকে, এবং আমরা খরচ-পত্রের তত আঁটাআঁটি করিয়া চলিতে শিখি না। যদি মরে যাই, রোজগারী দাদা অথবা ভাই আছেন, অবশ্যই আমার কন্যাদের বিবাহ, আমার পুত্রদিগের শিক্ষা এবং আমার পরিবারের ভাত কাপড় দিবেন। এই ভাবটী কোথাও পরিস্ফুট, কোথাও অপরিস্ফুটরূপে আমাদিগের অনেকেরই মনে থাকে। এই জন্য কন্যা পুত্র কলত্রাদির প্রতি সমূহ স্নেহবান্ হইয়াও এতদ্দেশীয় জনগণের পক্ষে সঞ্চয়শীলতা অপেক্ষা ব্যয়শীলতাই সমধিক প্রশংসার বস্তু হইয়া আছে। মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থাতে স্ত্রীপুত্রাদির মোটা ভাত কাপড়ের ঠিকানা রহিল—শাস্ত্রের শাসন, স্থূল দৃষ্টিতে, ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের প্রতি অধিকতর আস্থা জন্মাইয়া দিল, এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত সমাজ নিরন্তর দানধর্ম্মের প্রতি উত্তেজনা করিতে লাগিল, এই সকল কারণে আর্য্যসন্তান অপরাপর জাতি সমূহ অপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয়-সংযমশীল, আসব-ব্যবহার-বিবর্জ্জিত, শান্তস্বভাব এবং পরিণামদর্শী হইয়াও ক্রমে ক্রমে সঞ্চয়শীলতা গুণ পরিহার করিতেছেন। এই জন্যই দেখিতে পাই, কেহ বহু বৎসর ধরিয়া ৪।৫ শত টাকা মাহিয়ানা পাইয়াও লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য চাঁদার বহি বাহির হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, কোন আয়বান্ ব্যক্তি একখানি প্রকাণ্ড বসত-

বাটীর কতকদূর প্রস্তুত করিয়া মৃত হইলে তাঁহার ছেলেদিগকে ঐ বাটীর ইট কাঠ বেচিয়া খাইতে হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, খুব সচ্ছল পুরুষ যাই গেলেন, অমনি দেনার দায়ে তাঁহার ঘটী, বাটী, স্ত্রীর খোঁপা বাঁধিবার দড়ি গাছিটী পর্য্যন্ত, নিলামে উঠে। এই জন্যই প্রশংসাবাদ শুনিতে পাই—"অমুকের অত আয়, কিন্তু সঞ্চয় এক কড়াও নাই"—"অমুক স্বয়ং ঋণগ্রস্ত হইয়াও দান করিয়া থাকে"— "অমুক যাহা পান, তাহাই খরচ করিয়া ফেলেন—বলেন, ছেলেদের জন্য কিছু না রাখাই ভাল; ধনবানের পুত্রেরা প্রায়ই মন্দলোক এবং অকর্ম্মণ্য লোক হয়।"

আমার বিবেচনায় অমিতব্যয়িতার প্রশংসাবাদ সমাজের মঙ্গলকর নহে; যাহা কিছু আয় হয়, সকলই ব্যয় করিয়া ফেলা গৃহস্থধর্ম্মের অনুকূলাচরণ নহে, এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালীর প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধের সূচক নহে।

দানধর্ম্মের প্রশংসায় যদি অমিতব্যয়িতা বাড়িয়া যায়, তবে দান করিতে সক্ষম এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই ন্যূন হইয়া যায়; আত্ম-সংযম, ভবিষ্যদর্শন, উপায়োদ্ভাবন প্রভৃতি অনেকানেক উন্নত শক্তির খর্ব্বতা হইয়া পড়ে। কৃপণদিগের অনেক দুঃখ এবং অনেক দোষ বটে। কিন্তু তাহারা প্রায়ই সংযতাচারী, অবিলাসী এবং বাঙ্নিষ্ঠ হয়। পক্ষান্তরে খরচে লোকেরা প্রায়ই বিলাসী এবং অনেক স্থলে অনৃতবাদী হইয়া পড়ে। যে সমাজে শক্তিসঞ্চারের প্রয়োজন, তাহাতে কৃপণ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল, খরচে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল নয়। এতদ্দেশীয় যতগুলি সমাজের কথা আমি জানি, তাহার মধ্যে মাড়বারী জৈনদিগের প্রণালীই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহারা সচরাচর অতি দীন দরিদ্রের ভাবেই থাকে—উহাদিগের স্ত্রীলোকেরাও স্বহস্তে সকল গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করে। উহাদিগের মধ্যে মোটা কাপড় পরিতে, জলে ভিজিতে, পায়ে চলিতে ক্রোরপতিরও অপমান বোধ নাই। উহারা যে ব্যবসায়ে হাত দেয়, তাহাতেই সফলতা লাভ করে। ইহারা সহজে কেহ কিছু চাহিলে দেয় না। কিন্তু এমন মাড়বারী বণিক্ নাই বলিলেই হয়, যাঁহার সহায়তাবলে আর দুই তিনটী মাড়বারী নিরন্ন দশা হইতে উত্থিত হইয়া সচ্ছল অবস্থাপন্ন না হইয়াছে। ইহাঁরা দানধর্ম্ম এবং সঞ্চয়শীলতা দুইটীকে মিলাইতে জানেন, ইহাঁদের ঘরে লক্ষ্মী পুরুষানুক্রমে থাকেন। তবে আজি কালি দেখিতে পাই যে,

উহাঁদিগের মধ্যেও সংসর্গদোষ সংক্রামিত হইয়া কোন কোন মাড়বারী বণিকের পুত্র বিলাসী, অমিতাচারী এবং লক্ষ্মীছাড়া হইতেছে।

গৃহস্থকে যে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয়, এ কথা সকল দেশের বিজ্ঞ লোকেই বলিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ দার্শনিক বেকন্ বলিয়াছেন, যত আয় হইবে, তাহার অৰ্দ্ধেক সঞ্চয় করিবে। ইংরাজ জাতীয়েরা খুব উন্নতিশীল। উহাঁদের প্রাচীন দার্শনিক যে বিধি দিয়া গিয়াছেন, নব্য ইংরাজেরা তাহা অপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। আমি স্বদেশীয়দিগকে অতদূর করিতে বলি না। আমি স্বদেশীয়দিগকে বলি, তোমাদের শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছে, তোমরা সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট হইবে। শাস্ত্রে বলিয়াছে* ভবিষ্যৎ কালের জন্য আয়ের সিকি রাখিবে, অৰ্দ্ধেকে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ করিবে, আর এক আনা ধার দিয়া সুদে বাড়াইবে। ভগবান মনু বলিয়াছেন, তিন বৎসর খরচের যোগ্য অথবা এক বৎসরের যোগ্য, তিন দিনের যোগ্য, অন্ততঃ এক দিনের যোগ্য ধান্য সঞ্চয় করিবে। বাস্তবিক সকল লোকের পক্ষে সমপরিমাণ সঞ্চয় সম্ভবে না। যে ব্যক্তির আয় প্রতি পলে ১০ টাকা (যথা ভাণ্ডরবেল্টের) তাহার প্রতি পলে খরচ ৫ টাকা হয় না— তাহার সঞ্চয় অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক হয়। যে কমিশনর সাহেবের বেতন ত্রিশ দিনে তিন হাজার টাকা তাঁহার দৈনিক আয় ১০০ টাকা, খরচ বড় জোর ৬।৭ টাকা মাত্র; সুতরাং সঞ্চয় অৰ্দ্ধেকের অনেক বেশী হয়। কিন্তু এক জন মুন্সেফ, কি ডেপুটী, কি মাষ্টার যাঁহার বেতন তিন শত টাকা, তাঁহার কাচ্চা বাচ্চা এত, তাহার উপর জ্ঞাতি কুটুম্বের ভার এত এবং তাঁহার বাসা-খরচ এবং ঘর-খরচ দুয়ে জড়িয়ে এত যে, তিনি কোন মতেই তিন শতের ভিতর হইতে দুই শত খরচ না করিয়া চালাইতে পারেন না। ২০।২৫ টাকার আমলা, মুহুরি বা মাষ্টার আপনার পরিজনের মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান করিতেই বিব্রত, তিনি ঐ সামান্য আয় হইতে অৰ্দ্ধেক বা সিকি কেমন করিয়া বাঁচাই-

---

* পাদেন তস্য পারক্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তকং তথা॥
পাদস্যার্দ্ধার্দ্ধমর্থস্য মূলভূতং বিবৰ্দ্ধয়েৎ।
এবমারভতঃ পুংসশ্চার্থঃ সাফল্যমৃচ্ছতি॥
কুশূলধান্যকো বা স্যাৎ, কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যহৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা॥

বেন? তাহার পর, ধর দোকানদার এবং কারিগর; ইহাদেরও আয় ১০। ১৫ টাকা, তাহা হইতে খরচ পত্র করিয়া কত বাঁচাইবে?—আর যাহারা মজুরদার, তাহাদিগের ত দিনের আয় হইতে দিনেই সঙ্কুলান হয় না। অতএব যত আয় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক বা তৃতীয়াংশ বা সিকি বাঁচাইবে, বলিয়া যে উপদেশ, তাহা জনসাধারণের প্রতি খাটে না। এই জন্যই বোধ হয়, মনুসংহিতায় ওরূপ কোন নিয়ম বলিয়া দেওয়া হয় নাই—কেহ বা তিন বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিবে; কেহ বা এক দিনের আহারের উপযুক্ত সঞ্চয় করিবে। আমিও তাহাই বলি—সকলকেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে। যে দিন আনে, সে প্রতিদিন সঞ্চয় করিবে; যে মাসে আনে, সে প্রতিমাসে সঞ্চয় করিবে; যে বর্ষে আনে, সে প্রতি বর্ষে সঞ্চয় করিবে। কিন্তু কিছু সঞ্চয় সকলকেই করিতে হইবে। আর একটী নিয়ম এই যে, খরচের পূর্ব্বভাগে সঞ্চয় করিবে, খরচের শেষভাগে নয়। মনে কর, তুমি আজ দুই সের চাউল মজুরি পাইয়াছ; উহা হইতে কিছুই রাখিতে পার না। রান্না হইলে সকল ভাতগুলিই ফুরাইয়া যাইতে পারে। তবু এক মুঠা চাউল ঐ কলসিটাতে রাখিয়া দাও—বাকী চাউল রন্ধন হউক। আর তুমি মাসে দশটী টাকা পাও, খরচে কুলায় না; তবু দুই আনার পয়সা কোন মহাজনের কাছে গচ্ছিতরূপে কিম্বা সেবিংবেঙ্কে রাখিয়া বাকী হইতে খরচ চালাও। এইরূপে যে যাহা রাখিতে পারিবে, তাহা আগেই রাখিয়া দিবে। আর একটী নিয়ম আছে। যাহা সঞ্চিত হইল, পার্য্যমানে তাহা ভাঙ্গিয়া খরচ করিও না। সঞ্চিত অর্থকে কদাপি নিজের মনে করিতে নাই। বাস্তবিক উটী কাহার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব নহে। তুমি যাহা রোজগার করিতেছ, তাহাতে তোমার পরিজনের অংশ আছে—তুমি যাহা সঞ্চয় করিতেছ, তাহাতেও উহাদের অংশ আছে। তুমি সঞ্চয়ের ধন যদি পারিবারিক বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন খরচ করিয়া ফেল, তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরস্বাপহারী হইবে। এই জন্য ধর্ম্মশীল ব্যক্তির চক্ষে সম্মিলিত পরিবারের ব্যবস্থা অমিতব্যয়িতার প্রতিকূলরূপেই প্রতীত হয়।

সঞ্চয়শীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত গৃহস্থ লোকের পক্ষে নিম্নবর্ত্তী নিয়ম কয়েকটী যত্নপূর্ব্বক পালনীয়—

(১) সকলকেই কিছু সঞ্চয় করিতে হয়।

(২) সঞ্চয় করা খরচের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য, খরচের পরে নয়।

(৩) সঞ্চিত ধন হইতে সহজে খরচ করিতে নাই।

(৪) যে দ্রব্যে প্রয়োজন নাই এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে না।

(৫) যাহা ক্রয় করিবে, তাহা নগদ মূল্য দিয়া কিনিবে, ধারে কিনিবে না।

(৬) আয়-ব্যয়ের একটী হিসাব নিজ হাতেই রাখিবে।

[ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

অতিথি-সেবা।

"এক কপর্দ্দক হাতে না করিয়াও ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারা যায়।" এই জনপ্রবাদে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম।—করিতাম বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে এ দেশে আতিথ্য সৎকারের প্রথা যে প্রকার বলবতী ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ক্রমশঃ হীনবল হইতেছে। পূর্ব্বে কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী অতিথি আসিলে অতিথির প্রত্যাখ্যান ত প্রায়ই হইত না—বাটীতে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। গৃহস্বামী নম্রতা এবং ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক আগন্তুকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন; গৃহপ্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন—কি স্বপাকে খাইবেন? অতি সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন; গৃহ-প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন শুনিলে যেন কৃতার্থ হইতেন, এবং স্বপাকে খাইবেন শুনিলে বিশিষ্টরূপ শুচি হইয়া আয়োজন করিয়া দিবার নিমিত্ত লোক জনকে আদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন ঘরে তাদৃশ অতিথির ভোজন সমাপন—অন্ততঃ ভোজনার্থ উপবেশন—পর্য্যন্ত আপনারা কেহ জল-গ্রহণ করিতেন না।

আজি কালি আর ওরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন স্বপাকে ভোজী অতিথি, সহরের কথা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রামেও বড় একটা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন না। আর যাঁহারা গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে সম্মত, তাঁহারাও অসময়ে আসিলে গৃহস্থের বিরক্তিকর হইয়া পড়েন। গৃহস্থ তাদৃশ স্থলে বিরক্তি-সংগোপনে সতর্ক হয়েন বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন স্থলে—নিকটে দোকান

—সরাই—সদাব্রত অথবা হোটেল আছে, ইঙ্গিতক্রমে এরূপও বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভাল লোক আর প্রায়ই অতিথি হইয়া কোন গৃহস্থের দ্বারস্থ হইতে সম্মত হয়েন না। এখনকার অতিথির মধ্যে অধিকাংশ লোকেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলনিবাসী সন্ন্যাসী বা সাধু; ইহারা সদাব্রতে পেট টালিয়া, এবং গাঁজা খাইয়া বেড়ায়; ফল কথা, প্রকৃতরূপ অতিথি-সৎকার কালক্রমে যে উঠিয়া যাইবে, তাহার উপক্রম দেখা দিয়াছে। যত দিন একান্নবর্ত্তিতা থাকিবে, যত দিন উদর অথবা স্বাচ্ছন্দ্যচিন্তার উদ্বেগে এ দেশের লোকেরাও ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উদ্বেজিত হইয়া না উঠিবে, তত দিন আতিথ্য ব্যাপার একেবারে লোপ পাইবে না। কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালীর সভ্যতা বৃদ্ধির সহকারে যতই এ দেশের লোকেরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে; এবং পরস্পর অথবা আগন্তুক অপর জাতীয়দিগের প্রতিযোগিতায় একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আর হাঁপ ছাড়িবার অবসর পাইবে না, ততই ইউরোপের ন্যায় এতদ্দেশেও আতিথ্যধর্ম্মের হ্রাস হইয়া যাইবে।

কিন্তু এখনও সে দিন উপস্থিত হয় নাই—এখনও অতিথির সৎকার করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ধরা যায়—এখনও আমরা এই ধর্ম্মপালনের ফলভাগী হইতে পারি।

আমি এস্থলে যে প্রকার অতিথিসৎকারের কথা মনে করিতেছি, সে প্রকার অতিথি সচরাচর জুটে না। তিনি কোন পরিচিত বা ক্রিয়ার উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নহেন। তিনি কোন ভদ্রলোক—কার্য্যগতিকে অসময়ে তোমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মনে কর—বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার স্নান-ভোজন হয় নাই। তুমি কিরূপে তাঁহার সমাদর এবং অভ্যর্থনা করিবে? আমার বিবেচনায় তোমার কর্ত্তব্য যে, যথেষ্ট সত্বরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার স্নান ভোজনের যোগাড় করিয়া দাও—ভাল করিয়া পাঁচটা ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইবার উদ্দেশে বিলম্ব করিও না। নিজে স্বহস্তে তাঁহার জন্য কোন যোগাড় করিও। সকল কাজ চাকর চাকরাণীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। দুগ্ধপোষ্য শিশু ভিন্ন বাটীর অপর সকলের নিমিত্ত যে দুগ্ধ থাকে, তাহার কিছু কিছু লইয়া অতিথিকে দাও; অর্থাৎ যাহারা বুঝিতে পারিবার বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই বুঝিতে পারে যে, অতিথির জন্য তাহাদিগের খাবার সামগ্রী কিছু কিছু কম হইয়া গিয়াছে। অতিথির নিকট আপনার

ঐশ্বর্য্য অথবা জাঁক দেখাইবার নিমিত্ত কোন আড়ম্বর করিও না, কিন্তু যে দিন বাটীতে অতিথি আসিয়াছেন, সে দিন বাটীর অপর সকলের অপেক্ষা যেন অতিথির খাওয়াটী ভাল হয়, অবশ্য এরূপ চেষ্টা করিও। যদি অতিথির সৎকার করায় বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের কোন উপভোগের কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, তবে অতিথি-সৎকারে সমগ্র ফললাভ হয় না। কিন্তু যেখানে কাহার উপভোগের ত্রুটি না হইয়া অতিথির সম্যক্ সৎকার হয়, সে বাটীতে মিতব্যয়িতার নিয়মগুলিও যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় না, এমন বলা যাইতে পারে।

অতিথির সহিত আলাপে তাঁহার পরিচয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিও না। নিজের বিদেশপর্য্যটন যদি কিছু হইয়া থাকে, সেই বিষয়েই কথা কহিতে পারিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ যদি স্বয়ং কখন অতিথি হইয়া উত্তম সৎকার লাভ করিয়া থাক, তবে সেই কথা কহিও; উহা অতিথির বিশিষ্টরূপে হৃদয়গ্রাহিণী হইবে।

কখন কখন এমন সকল লোককে অতিথি হইতে হয়, যাঁহারা স্থানমাত্রের অথবা দ্রব্যবিশেষের প্রার্থী হইয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন রীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ কোন কোন ব্যক্তি তাদৃশ অতিথির প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, যদি আমার দ্রব্যই খাবেন না, তবে শুদ্ধ জায়গা দিব কেন?—অথবা যদি সিধাই লইবেন না, তবে একটু দুগ্ধ কিম্বা মৎস্য দিয়া কি হইবে?—এই সকল লোক, আতিথ্য সম্পাদনে যে পুণ্যলাভ হয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই পুণ্যের প্রতি একান্ত লুব্ধ। কিন্তু লোভ মহাপাপ—পুণ্যের প্রতি যে লোভ, তাহাও পাপ। অতএব ঐ পুণ্যের লোভও পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যাহার যেটী প্রয়োজন, তাহাকে তাহাই দিবার চেষ্টা পাইবে। তোমার ঘরে বসিয়া অতিথি আপনার দ্রব্য খাইবেন, ইহাতে লজ্জা বোধ করা রাজস প্রকৃতির লক্ষণ—বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক স্বভাবের লক্ষণ নয়।

তবে একটী কথা আছে। ওরূপ অতিথির নিকট স্বয়ং থাকিয়া আলাপ পরিচয় করিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। তাঁহার জন্য স্বহস্তে কোন যোগাড় করিয়া দিবারও প্রয়োজন নাই।—তাঁহার পরিচর্য্যায় দাস-দাসীর নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে অতিথির আজ্ঞা সকল সত্বরে পালন করিবার আদেশ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য দান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। মুষ্টিভিক্ষাদান অতি সৎকার্য্য বলিয়াই আমার বোধ হয়। ভিখারীর শরীর সবল এবং কর্ম্মক্ষম, অতএব তাহার ভিক্ষা করা উচিত নয়, তাহার খেটে খাওয়াই উচিত—এ সকল বিচার গৃহস্থকে করিতে হইবে না। উহা সমাজের বিচার্য্য বিষয়। তোমার দ্বারে যে ভিখারী আসিল, তুমি তাহার প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া এবং চাকর চাকরাণী কাহাকেও কটুভাষা কহিতে না দিয়া এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও, সে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাউক। ঐ ভিক্ষাদান কার্য্যটী বাটীর শিশুদিগের হাত দিয়া করানই ভাল। মুষ্টিভিক্ষা ভিন্ন আরও নানা প্রকার চাঁদায় গৃহস্থকে অর্থদান করিতে হয়। বিদ্যালয়ের জন্য, পুস্তকালয়ের জন্য, ডাক্তারখানার জন্য, বাপ মা মরা দায়ের জন্য, বারোএয়ারির জন্য, দুর্ভিক্ষ পীড়া নিবারণের জন্য গৃহস্থকে প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু দান করিতে হয়। আমার বিবেচনায় ঐ সকল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যাত করিতে নাই। সকলকেই কিছু কিছু দান করিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে একটী কথা আছে, দিব বলিয়া না দেওয়া, না দেওয়ার চেয়েও অধিক দোষাবহ। বরং চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া একবারেই দিব না বলা ভাল, কিন্তু দিতে স্বীকার করিয়া কোন মতেই টালমাটাল করা উচিত নয়। যেটী দিবে বলিবে, সেটী ঠিক সময়েই যথা পরিমাণে দিবে। ফল কথা, দানধর্ম্মের মুলসূত্র এই, দাতা এমন ভাবে দান করিবেন, যেন গৃহীতার বোধ হয় যে, উনি দান করিতে পাইয়া আপনাকে উপকৃত এবং কৃতার্থ মনে করিতেছেন। দানধর্ম্মের এই মুলসূত্র সম্যক্ রূপে সংরক্ষিত হইবার জন্যই শাস্ত্রকারেরা বর্ণ-শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণদিগকে দানের মুখ্যপাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ধর্ম্মোপদেষ্টা, সংসার-বিরাগী ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করিয়া আত্মগ্লানির ভাজন হয়েন না। তাঁহারা দান গ্রহণ দ্বারা দাতারই বিশেষ উপকার করিলেন, এরূপ মনে করিতে পারেন।

[ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বাল্য-বিবাহ।

সম্প্রতি এক জন সরলচেতা বহুদর্শী ইংরাজের সহিত বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। ক্ষণকাল বিচারের পর তিনি বলিলেন, বাল্য-বিবাহ-প্রণালীতে জাতিগত শান্তি ও ব্যক্তিগত সুখের আধিক্য এবং বয়োধিক-বিবাহ-প্রণালীতে জাতিগত উদ্যম ও ব্যক্তিগত ওজস্বিতার আধিক্য লক্ষিত হয়। এই কথা বলিয়া তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, উভয় প্রণালীর সামঞ্জস্য বিধানের কোন পথই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি বলিলাম, আমাদিগের প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা বোধ হয় ঐরূপ সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশেই স্ত্রীর বয়স কম এবং পুরুষের বয়স অধিক রাখিয়া উদ্বাহপ্রণালীর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ, দ্বাদশবর্ষীয়া মনোমত কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইংরাজটী বলিলেন—তাহা হইলেও হইবে না—অপক্ক-মাতৃশরীর-প্রসূত সন্তান সুস্থ এবং সবলকায় হইবে না। আমি বলিলাম, আপনাদিগের ভাষায় পশুপালন সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কোন নব্য এবং বহুজনসম্মত গ্রন্থে ওরূপ কোন কথা নাই—পিতৃশরীর যথাযোগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই সন্তান পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ এবং সবলকায় হইতে পারে, পশুজননবিধানে এই মত। ইংরাজটি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরিপাক অল্প বয়সেই হয় বটে—সুতরাং পুরুষের বয়স অধিক এবং স্ত্রীর বয়স কম রাখিয়া বিবাহ দেওয়াই বিধেয় এবং তাহাতে সকল দিকই বজায় থাকিতে পারে দেখিতেছি—প্রণয়, শান্তি এবং সুখ অধিক হয়, উদ্যম এবং ওজস্বিতা জন্মিবারও অবসর থাকে, এবং সন্তানও বলহীন হয় না। আমি বলিলাম, বর্ত্তমান অবস্থাতেও হিন্দু দম্পতির পিতৃ-মাতৃগণ কিঞ্চিৎ পরিণামদর্শী হইলে এবং তাঁহারা স্বয়ং একটু তপস্যাপরায়ণ হইলে, ঐ সকল শুভফল দর্শিতে পারে।

মোটামুটি ভাবিতে গেলেও বয়োধিকদিগের বিবাহটা যেন কেমন কেমন দেখায়। ১৯। ২০ বৎসরের যে যুবতী ২৪। ২৫ বৎসরের এক জন পুরুষকে লইয়া আপনার মা, বাপ, ভাই, ভগিনী, প্রভৃতি

আশৈশব সহচর সমস্তকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি যে কেমন 'লজ্জাভয়বিভূষণা' তাহা অনুভব করিতেও পারা যায় না। ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে দুইটীকে মিলাইয়া দেন, তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটী নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠে। তাহাদিগের মধ্যে যে প্রকার চিরস্থায়ী প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা, বয়োধিকদিগের বিবাহে সেরূপ চিরস্থায়ী প্রণয় কিরূপে জন্মিবে? বয়োধিকদিগের মন পাকিয়া যায়, অভ্যাস স্থির হইয়া দাঁড়ায়, চরিত্র নির্দ্দিষ্টপথ অবলম্বন করে; তাহারা কি আর তেমন পরস্পরে মিলিয়া একতাসম্পন্ন হইতে পারে? ফলতঃ দম্পতির পরস্পর প্রণয়াধিক্য উৎপাদন করাই যদি উদ্বাহ-প্রণালীর মুখ্যতম সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায়, তবে বাল্য-বিবাহ যে বয়োধিক-বিবাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় থাকে না। ছেলেবেলার ভালবাসাই ভালবাসা। মা বাপের প্রতি, ভাই ভগিনীর প্রতি, খেলুড়িদিগের প্রতি মনটী যেমন কোমলভাবাপন্ন থাকে, বয়স হইলে যাহাদিগের সহিত পরিচয় হয়, তাহাদিগের কাহারও প্রতি প্রায়ই মন তেমন হয় না। ছেলেবেলার বন্ধুদিগের কোন দোষই ধরিতে ইচ্ছা হয় না। তাহারা যাহা করে, তাহাই ভাল, যাহা বলে, তাহাই মধুর। তাহাদিগের কাহাকেও দেখিলে, ভাবিলে, কাহার নাম মাত্র শুনিলে, মন সরস এবং আর্দ্র হইয়া পড়ে। এমন ছেলেবেলার সময় দাম্পত্য প্রণয়ের বীজ বপন না করিয়া যাহারা বিলম্ব করে, তাহারা প্রণয়পীযূষের প্রকৃত রসাস্বাদনে নিতান্ত বঞ্চিত থাকে।

বয়স হইয়া বুদ্ধির পরিপাক জন্মিলে, পরস্পর স্বভাব চরিত্র বুঝিয়া প্রণয়ে যুবতী বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারে, এই যে একটী কথা আছে, উটী কথার কথা মাত্র। অন্যের স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা করিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। ঐ কার্য্যে অতি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিদিগেরও পদে পদে ভ্রম হইয়া থাকে। ১৯।২০ বৎসরের স্ত্রীলোক এবং ২৪—২৫ বৎসরের পুরুষের ত কথাই নাই। ঐ বয়সে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবলা, কল্পনাশক্তি তেজস্বিনী, এবং অনুরাগ একান্ত উন্মুখ। পরস্পরের স্বভাব পরীক্ষায় যে বিবেক এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা ঐ সময়ে অকর্ম্মণ্যপ্রায় থাকে। একটী সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ, একটী মৃদুমধুর হাস্য, একটী অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র্য, হঠাৎ মনোদুর্গ অধিকার করিয়া লয়; স্বভাব, চরিত্র, রুচি, পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেয় না। এই

জন্য অধিক বয়সে বিবাহ সাধারণতঃ চিরস্থায়ী প্রকৃত প্রণয়ের উৎপাদক হইতে পারে না।

দেখ, যে দেশে অধিক বয়সে পরিণয়ের নিয়ম, সেই দেশেই পরিণয়োচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রচলিত *। যদি প্রকৃতরূপে স্বভাবাদির পরীক্ষা হইতে পারিত, তবে ওরূপ হইবে কেন? ফলতঃ অন্ধ-অনুরাগ-প্রণোদিত উদ্বাহবন্ধনে প্রকৃত প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা বিরল। সেই জন্যই কারণান্তর উপস্থিত হইয়া ঐ বন্ধনের রক্ষা এবং দৃঢ়তা সম্পাদন না করিলে, উহা স্বতই বিচ্ছিন্ন এবং স্খলিত হইতে পারে। ইংরাজেরা অধিক বয়সে বিবাহ করেন, তাঁহাদিগের দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ করিবারও ব্যবস্থা আছে। ঐ ব্যবস্থা তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ সহজ নয় বলিয়া, ইংরাজেরা আজি কালি বড়ই দুঃখিত। মার্কিন্‌দিগের দেশেও অধিক বয়সে বিবাহ করিবার নিয়ম। সম্প্রতি ঐ দেশে বিবাহপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনেকে মত প্রচার করিতেছেন। যদি ঐ সকল দেশে উদ্বাহবন্ধন সুখের বন্ধন হইত, তবে ঐ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য এত যত্ন এবং এত আগ্রহ কেন হইবে? বস্তুত যেখানে যত অধিক বয়সে বিবাহ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সেই খানেই ঐ প্রকার গোলযোগ অধিক পরিমাণে ঘটিতেছে। উহা অধিক বয়সে বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া ধরা যায়।

স্পেন, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি দেশের স্ত্রীলোকেরাও ত লেখা পড়া শিখে, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় ঐ সকল দেশে এ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাবিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমার বিবেচনায় ঐ সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া দম্পতির পরস্পর প্রণয় অধিক।

কোন কোন ইংরাজ পর্য্যটক বলেন বটে যে, স্পেন, ইটালী প্রভৃতি যে সকল দেশে বাল্য-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় কার্য্যতঃ উদ্বাহবন্ধন নিতান্ত শিথিল। তাঁহারা বলেন, ঐ সকল দেশের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উচ্ছৃঙ্খল এবং ভ্রষ্টাচার। কিন্তু ঐ সকল পর্য্যটকেরা সাধ্বী স্ত্রীজাতির পবিত্র আবাসভূমি ভারতবর্ষের প্রতিও ঐ প্রকার কটাক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে লঘুপ্রকৃতিক মনে করিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত কথা অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করাই যুক্তিসঙ্গত।

* কনেক্টিকট্ প্রদেশে প্রতি দশটীর মধ্যে একটী, কালিফর্ণিয়ায় প্রতি শতটীর মধ্যে একটী বিবাহের বিচ্ছেদ হয়।

যে দেশে বয়োধিক হইলে বিবাহ হয়, সেই দেশেই বিবাহ-বন্ধন শিথিল, এবং দম্পতিপ্রণয় অন্ধ-অনুরাগ-মূলক বলিয়া অচিরস্থায়ী।

[ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বৈধব্য-ব্রত।

আমি বলিয়াছি যে, গৃহশূন্য ব্যক্তি স্বদেশবৎসলরূপেই হউক, আর ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াই হউক, তপশ্চরণ করিবেন। এখন দেশের এবং সমাজের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বিধবা কি করিবে, আর পরিবারের অপর সকল লোকেই বা বিধবার প্রতি কি ভাবে চলিবে, আমি সেই কথাই কিছু বলিব।

বৈধব্য একটী মহৎ ব্রত। ব্রতটী পরার্থে আত্মোৎসর্গ। আত্মোৎসর্গ-ব্রতের অনুষ্ঠান কিছু না কিছু সকলকেই করিতে হয়—কেহ জেনে শুনে করেন, কেহ না বুঝিয়া করেন,—কেহ অল্পমাত্রায় করেন, কেহ অধিক মাত্রায় করেন—কিন্তু সকলেই ইহা করিয়া থাকেন। তবে অন্যের পক্ষে এই ব্রতের শিক্ষা এবং ইহার পালন ধীরে ধীরে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য ইহার ক্লেশানুভব অল্প হয়—স্থলবিশেষে কোন ক্লেশই হয় না। বিধবার পক্ষে এই ব্রতের ভার একেবারে চাপিয়া পড়ে, এই জন্য সে বিকল হইয়া যায়। এত বিকল হয় যে, সে যে একটী মহৎ ব্রতের ব্রতী হইল, তাহা বুঝিতেই পারে না—সে বুঝে "আমি জন্মের মত গেলুম।" বাস্তবিক সে নিজের পক্ষে জন্মের মতই যায়। সে একেবারেই উদাসীনী, সর্ব্বত্যাগিনী, ব্রহ্মচারিণী হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী, উদাসীন ব্যক্তিদিগের প্রতি মনুষ্যসাধারণের মনের ভাব কি হয়? সকল মনুষ্যই সংসারবিরাগীদিগের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিধবাও তদ্রূপ ভক্তি এবং শ্রদ্ধার পাত্রী। তবে একটী কথা আছে। যাঁহারা জ্ঞানপথাবলম্বী হইয়া সংসারের প্রতি একান্ত তিতিক্ষা বশতঃ সংসারত্যাগী হয়েন, তাঁহাদিগের মানসিক বল এবং দৃঢ়তার প্রতি যতটা ভক্তি হয়, যাঁহারা সাংসারিক দুঃখে পরিতপ্ত ও দৈব-দুর্ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন, তাঁহাদের প্রতি ততটা প্রগাঢ় এবং বিশুদ্ধ ভক্তি হয় না—

তাঁহাদের প্রতি যে ভক্তি হয়, তাহার সহিত অনেকটা দয়াও মিশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি জানি, ৺ কাশীধামে একটী অতি পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ আছেন, যিনি প্রথমে শুদ্ধ দৈব-বিড়ম্বনা বশতই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠদ্দশাতেই পুত্র-কলত্র গতাশু হইয়াছিল। তিনি সেই দুঃখেই গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে যোগাভ্যাস এবং অন্যান্য তপশ্চরণদ্বারা সর্ব্বলোকের প্রতি, অগাধ-প্রীতি-সম্পন্ন, অতি সদালাপী, মধুরভাষী এবং পরোপকারপরায়ণ হইয়া সকলের প্রীতি, ভক্তি এবং বিশ্বাসভাজন হইয়া আছেন। ঐ মহাপুরুষই বিধবাদিগের আদর্শস্থলীয়। তাঁহার ন্যায় দৈববিড়ম্বনা নিবন্ধন সন্ন্যাসাশ্রমগ্রস্ত বিধবারও কর্ত্তব্য, আত্মদমন এবং পরোপকার-ব্রত পালন দ্বারা আপনাকে তেমনি শুচি, শান্ত এবং সুখী করিয়া তুলেন।

যে পরিবারে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছে, সে পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই যেন বিধবার প্রকৃত অবস্থা ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত না হয়েন। সে বাটীর স্ত্রী পুরুষ সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, বিধবা দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়াছে। দৈব-বিড়ম্বনা কর্ত্তৃক সেই কঠোর ব্রতাবলম্বন করিয়াছে, অতএব সে একান্ত দয়ার পাত্রী; অমন উচ্চব্রত ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহাকে বিশেষরূপেই ভক্তি করিতে হইবে। বিধবার প্রতি এই মিশ্রভাব অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে, তাহার তপস্যার বিঘ্ন অল্পই হইবে, তাহার অশন বসন জন্য অনেকটা ক্লেশ ন্যূন হইবে এবং তাহার হৃদয়ে আত্মগৌরবের প্রাখর্য্য যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, অমনি শম-দমাদি ব্যাপার সুকর হইয়া উঠিবে।

পরিবারস্থিত বিধবার পালনে কর্ত্তার কোন মতেই অমনোযোগী হইলে চলিবে না। বিধবারা যে ব্রতের ব্রতী হইয়া পড়ে, তাহাতে বয়স এবং অবস্থাভেদে তাহাদিগের প্রকৃতি ভিন্ন হয়, এবং তাহাদিগের সুপালনার্থ বিভিন্নরূপ ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়। এক, প্রাচীনা বা প্রৌঢ়া সসন্তানা বিধবা—ইহাঁদিগকে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দিবে—তীর্থাদিদর্শনের অভিলাষ সম্পন্ন করিতে দিবে—ইহাঁদিগের সহিত বিনা পরামর্শে সাংসারিক বন্দোবস্ত করিবে না—এবং ইহাঁদিগকে যাহা কিছু বলিতে হইবে, তাহা বাটীর কর্ত্তা নিজেই বলিবেন—ঝি বৌয়ের মুখ দিয়া কদাপি বলিবেন না। বিধবা মাতাকে স্ত্রীর মুখ দিয়া কিছু বলিতে গিয়া অনেক যুবা মাতৃস্নেহ হারাইয়াছেন। এই

সকল বিধবার সন্তানেরা যাহাতে বাটীর সমবয়স্ক এবং সমবয়স্কা অপরাপর পুত্রকন্যার সহিত দৃঢ়রূপে সৌহার্দ্দবন্ধনে সম্বদ্ধ হয়, প্রথম হইতেই তাহার উপায় করিয়া যাইতে হইবে। দ্বিতীয়, যুবতী সসন্তানা বিধবা—ইহাঁদিগকে নিজ সন্তানের যত্নে যত ইচ্ছা সময় ক্ষেপণ করিতে দিবে, কিন্তু ঐ সন্তানের সমবয়স্ক অথবা তাহার হইতে কিছু অল্পবয়স্ক বাটীর অন্য ছেলেও যাহাতে ঐ যত্নের ফলভাগী হয়, বিশেষ চেষ্টা পূর্ব্বক তাহারও উপায় বিধান করিবে। বিধবার হৃদয় যেন স্নেহ বিস্তার করিবার পথ পায়, যেন কোন মতেই ঐ স্নেহরাশি অল্পমাত্র স্থানে বদ্ধ থাকিয়া দূষিত না হয়, এবং বিধবার হৃদয়ে আত্মপরবোধটী উত্তেজিত করিয়া ঈর্ষাদ্বেষাদির প্রভাবে তাহার প্রকৃত ব্রতভঙ্গ না করে। বিধবা যাহাতে বাটীর সকল ছেলেকেই ভাল বাসে, তাহা করিতে না পারিলে, তাহার প্রতি উচিত ব্যবহারের ত্রুটি হইতেছে বুঝিতে হইবে। তৃতীয়, নিঃসন্তানা বাল্যবিধবা—ইহাঁদের প্রতিপালন, শুদ্ধ ভাত কাপড়ের প্রতিপালন নয়, ইহাঁদিগের ধর্ম্মোন্নতিসাধন, অতি কঠিনতম ব্যাপার। এই জন্য বিশেষ কঠিন যে, ইহাঁদিগের বাল্যের সাহজিক স্বার্থপরতার অতি প্রধান সংস্কার দুইটী বাকী রহিয়া গিয়াছে—উহা পতিপ্রেমাগ্নিতে দ্রবীভূত হইয়া কখন পাত্রান্তরে বিস্তৃত হয় নাই—সন্তানবাৎসল্যরসে পরিষিক্ত হইয়া কাহাকেও নাড়ীছেঁড়া ধন রূপে প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাঁদিগের মন উদার না হইয়া ক্ষুদ্র, প্রীতিপূর্ণ না হইয়া শুষ্ক, এবং সদয় না হইয়া ঈর্ষাপ্রবণ হইয়া পড়িবার বড়ই সম্ভাবনা। তবে একটী ভরসা আছে। এতদ্দেশের সদ্বংশজাতা বালিকাগণের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রগাঢ় ভক্তিবীজ উপ্ত হইয়া থাকে। পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি, শাস্ত্রশাসনে ভক্তি, ইহাদিগের যেন সহজাত ধর্ম্ম। তাহারই উপর অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়, এবং বিবেচনাপূর্ব্বক চলিতে পারিলে, ঐ ভক্তিবীজ হইতেই অতি বিপুল প্রীতির উদ্গম হইয়া ইহাঁদিগের জীবনক্ষেত্রকে সরস, শীতল এবং আত্মপর উভয়ের সুখপ্রদ করিয়া তুলিতে পারে। যেরূপে সতর্ক হইয়া চলিলে, বালবিধবার সুপালন হয়, তাহার কয়েকটী নিয়ম বলিতেছি।

(১) বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে, কর্ত্তা স্বয়ং ইহাদিগের আহারের নিয়ম করিয়া দিবেন। এত দুগ্ধ, এই এই ফল, এইরূপ অন্নব্যঞ্জন, বিধবার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যেমন দেবতার নামে যে দ্রব্যাদি সমাহৃত

হয়, তাহা বাটীর অপর কাহাকেও খাওয়াইতে নাই, তেমনি বিধবার নিমিত্ত যাহা বাটীর কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহা বাটীর অপর কাহাকেও প্রদান করিতে নাই।

(২) বিধবার শয়ন দুই একটী শিশুসন্তানের সমভিব্যাহারে করাইবে। বিধবাকে ছেলেদের আবদার সহাইবে।

(৩) বিধবাকে সাংসারিক কার্য্যে বিশিষ্টরূপে উন্মুখ করিয়া তুলিবে। শুদ্ধ অনুজ্ঞা দ্বারা নয়, বিধবাকে সধবা স্ত্রীলোকদিগের গৃহ-কার্য্যের সহকারিণী করিয়া দিবে।

(৪) যদি পার, বিধবাকে সংস্কৃত শিখাইবে—অন্ততঃ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনাইবে; এবং তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করাইবে।

(৫) বিধবাকে ব্রতাদি করিতে দিবে—নিজে তাহা করিতে বলিবে না, কিন্তু করিতে চাহিলেই করিতে দিবে এবং ব্রতাদির উদ্যাপন উপ-লক্ষে ব্যয়সঙ্কোচ করিবে না। শরীরের খাটুনি তাহার, টাকা তোমার। বাটীর সধবা স্ত্রীলোকেরা যেন ঐ সকল ব্রত অথবা তদনুরূপ অপরা-পর ব্রত করিতে না পারেন, এবং তাঁহাদের ব্রতাদি উদ্যাপনে যেন স্বল্পতর ব্যয় এবং অনধিক আড়ম্বর হয়।

(৬) বিধবাকে কোন অনুজ্ঞা করিতে হইলে, কর্ত্তা তাহা স্বয়ং করি-বেন—স্ত্রী, কন্যা, কিম্বা পুত্রবধূ প্রভৃতি অপর কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা করিবেন না। কিন্তু অনুজ্ঞা যেন সত্য সত্যই কর্ত্তার নিজের হয়, অর্থাৎ নিজেই দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যেন অনুজ্ঞা করেন—গৃহিণী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং স্বয়ং তাঁহারই মুখস্বরূপ না হয়েন। নিতান্ত স্ত্রৈণ কর্ত্তার দ্বারা বিধবার সুপালন প্রায়ই ভালরূপ হইয়া উঠে না।

উল্লিখিত নিয়মগুলি বুদ্ধিপূর্ব্বক পালিত হইলে বালবিধবার যে কিরূপ ধর্ম্মোন্নতি সংসাধিত হয়, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিবেন। বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগসুখ পরিত্যাগ করে, গৃহকার্য্যে অতি নিপুণা হইয়া উঠে, অতিথি, অভ্যাগত, কুটুম্ব, সজ্জনদিগকে খাওয়াইতে ভাল বাসে, স্বয়ং সবল এবং সুষ্ঠু-শরীরী হয়, এবং ঈর্ষাদিদোষপরিশূন্য হইয়া সধবাদিগের প্রতি অনুগ্রহশালিনী এবং তাহাদিগের পুত্রগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহশীলা হয়। যে বাটীতে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে বাটীতে একটী জীবন্ত দেবীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান। যে পরিবারের মধ্যে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে পরিবারের স্ত্রীপুরুষেরা নিরন্তর ঋষি-চরিত্রের দ্রষ্টা এবং ফল-

ভোক্তা। তাহারা "পরার্থজীবন" ব্যাপারটী কি, তাহা শুদ্ধ মুখে বলে না, এবং পুস্তকে পড়ে না—উহার জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পায়।

[ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

সভ্যতা।

আজি কালি যেখানে সেখানে সভ্যতা শব্দটী লইয়া বিলক্ষণ টানা-টানি পড়ে। চলিত কথাবার্ত্তায়, সাময়িক পত্রিকায়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, ঐতিহাসিক বা দার্শনিক প্রবন্ধে ও বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সভ্যতা শব্দের ছড়াছড়ি। ইহাতে মনে হইতে পারে যে সভ্যতা কাহাকে বলে, আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু সভ্যতার লক্ষণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে, দেখিবে অনেকেই সদুত্তর দিতে পারেন না; আর ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ ভাবেন যে, প্রাচীন ভারতবাসীরা সভ্যতার চরমসোপানে উঠিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন, ইংরেজেরাই সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। কেহ আমাদিগের আচার ব্যবহার সভ্যসমাজের উপযোগী জ্ঞান করেন; কেহ ইংরেজদিগের রীতিনীতির পক্ষপাতী। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, ইংরেজদিগের অনুকরণে আমাদিগের অবনতি হইবে; কেহ কেহ বা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হন যে, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি, অথচ মাদুরে বসি, হাত দিয়া আহার করি, সর্ব্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না, ও মৃণ্ময় দীপের আলোকে লেখা পড়া করি।* শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা শুনিয়া বোধ হয়, তাঁহারা কলিকাতার লালবাজারের মদোন্মত্ত বর্ণজ্ঞানশূন্য গোরাকেও সভ্য বলিতে প্রস্তুত; কিন্তু ধুতীচাদরপরা নিরামিষভোজী নির্ম্মলজলপায়ী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকেও অসভ্যশ্রেণীতে স্থান দিতে চাহেন।

---

* "It is curious to reflect that the most learned works on European literature and science should be studied and appreciated by the student who sits on a mat, eats with his fingers, does not think it necessary to cover his body, and reads under the light of the primitive earthen lamp"—*Mr. Manomohun Ghose on English Education.*

সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে এরূপ মতভেদ হইবার প্রথম কারণ এই যে, আমরা এক্ষণে দুইটী প্রতিকূল স্রোতের মাঝে পড়িয়াছি, (১) দেশীয় শিক্ষা এবং (২) বিলাতী শিক্ষা। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে এক দিকে লইয়া যাইতেছে; বিলাতী শিক্ষা আর এক দিকে। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে বলিতেছে যে, এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীতিনীতি, চিরাগত আচারব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড উত্তম। বিলাতী শিক্ষা পদে পদে তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছে, এবং তাহাদিগের অপেক্ষা ভাল বলিয়া পাশ্চাত্য রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড আমাদিগের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ ধরিতেছে। দেশীয় শিক্ষা বলিতেছে যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন মহিমা পুরাতনপ্রণালীসম্ভূত। বিলাতী শিক্ষা বলিতেছে যে, পুরাতন পথ পরিত্যাগ না করিয়াই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, কেহ দেশীয় স্রোতে, কেহ বা বিলাতী স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং কেহ দোটানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

সভ্যতা সম্বন্ধে মতভেদ হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, গূঢ়ভাবব্যঞ্জক বা বহুগুণবাচক কথা শুনিয়া প্রায়ই মানসপটে তদনুযায়ী একটা স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি উদিত হয় না; সুতরাং কথাটী সঙ্গতরূপে ব্যবহৃত হইল কি না অনেক সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না। এই কারণেই অনেক সময়ে বড় বড় কথায় লোক ভুলাইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক সময়ে পবিত্র "ধর্ম্মের" নামে ভূমণ্ডল শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে! এই কারণেই অনেক সময়ে "স্বাধীনতার" পতাকা উড়াইয়া স্বেচ্ছাচারিতা ফ্রান্স্ প্রভৃতি কত দেশে রাজত্ব করিয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে অসভ্য জাতিদিগকে "সভ্য" করিবার ছলে তাহাদিগকে নির্ম্মূল বা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, প্রভৃতি বড় বড় কথার অর্থ যে অধিকাংশ লোকেই ভাল করিয়া বুঝে না, ইহা ইউনানী পণ্ডিতকুলচূড়ামণি সক্রেতিস্ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যদি তিনি ভূমণ্ডলে পুনরাগমন করিতে পারিতেন, তিনি দেখিতে পাইতেন যে, দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আথেন্স্ মহানগরীতে লোকে অর্থ না বুঝিয়া যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করিত, এই উন্নতিগর্ব্বিত ঊনবিংশতি শতাব্দীতেও সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিবর্গও সেইরূপ করিয়া থাকেন।

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থের

আভাস কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া যায়। ব্যুৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যায় যে "পক্ষী" শব্দে পক্ষবিশিষ্ট জীব বুঝায় এবং "উরগ" বলিতে বুকের উপর ভর দিয়া চলে এমন কোন জন্তু বুঝায়। এই প্রণালীতে "সভ্যতা" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে দেখা যাইতেছে যে, সমাজবাচক "সভা" শব্দ হইতে সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি, সুতরাং সভ্যতা শব্দের অর্থ সামাজিকতা হইতেছে, অর্থাৎ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে, যাহা কিছু তদবস্থার উপযোগী, তাহাই সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণনীয় হইতেছে।

কিন্তু কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেক সময়ে তাহার প্রচলিত অর্থ জানিতে পারা যায় না। ব্যুৎপত্তি দেখিয়া জানা যায় যে "তৈল" বলিতে প্রথমে তিলের নির্যাস বুঝাইত; কিন্তু এক্ষণে আমরা সরিষার তৈল, বাদামের তৈল, মাস তৈল ইত্যাকার অনেক প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং প্রচলিত প্রয়োগে তৈল বলিতে কেবল তিলের নির্যাস না বুঝাইয়া নানাপ্রকার নির্যাস বুঝাইতেছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিতে গেলে "অম্লজান" শব্দে যে বায়ুর সংযোগে অম্ল উৎপাদিত হয় সেই বায়ুকে বুঝায়। আদৌ রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই অর্থেই "অম্লজান" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এমন অনেক অম্ল আছে যাহাতে উক্ত অম্লজান বায়ু নাই। সুতরাং এখন আর ব্যুৎপত্তি দেখিয়া "অম্লজান" শব্দের প্রচলিত অর্থ জানা যায় না। এই প্রকার, দোহনবোধক দুহ ধাতু হইতে দুহিতা শব্দের উৎপত্তি; কিন্তু এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গৃহে গাভীদোহন যাহার কার্য্য সে দুহিতা নহে। ব্যুৎ-পত্তি অনুসারে, যে পালন করে সেই পিতা। এরূপ হইলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বহুসন্তানসত্ত্বেও পিতা নামের অধিকারী নহেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপ স্থলে সভ্য ও অসভ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগকে আমরা অসভ্যজাতি বলি, তাহাদিগের সহিত যদি আমরা সভ্যনামপ্রাপ্ত জাতিদিগের তুলনা করি, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে। যে অসভ্যজাতি বিচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণশীল অল্পসংখ্যক লোকের সমষ্টি; সভ্যজাতিগণ বহুসংখ্যক লোকে একত্রিত হইয়া গ্রামে ও নগরে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থিতি করেন। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রায় নাই বলিলেই হয়; সভ্য-জাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বাহুল্য। অসভ্যজাতিদিগের

মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব প্রধান, কদাচিৎ যুদ্ধোপলক্ষ ব্যতি-রেকে অনেকে সমবেত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং অনেকে একত্র হইয়া থাকিতেও ভালবাসে না; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে আসঙ্গ-লিপ্সাপ্রবৃত্তি বলবতী, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করে, এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থে অনেকে সমবেত হইয়া থাকে। অসভ্য-জাতিদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায় কেবল স্বীয় ছল বলের উপর নির্ভর রাখিতে হয়, এবং প্রত্যেকের স্বত্বরক্ষা জন্য আইন, আদালত বা রাজশাসন নাই; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে স্ব স্ব শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার্থে লোকে আপন আপন শক্তি অপেক্ষা সামাজিক শাসনের সহায়তা অবলম্বন করে।

পৃথিবীতে এমন অসভ্যজাতি অল্প, যাহাদিগের মধ্যে সমাজবন্ধনের সূত্রপাতমাত্র হয় নাই; এবং অদ্যাপি ভূমণ্ডলে এমন কোন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় না, যাঁহারা সামাজিক অবস্থার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরো-হণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে সামা-জিক ভাবের তারতম্যানুসারেই অনেক পরিমাণে সভ্যতার তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়। এই সামাজিক ভাব বলিতে কি বুঝায় একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ, সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে এক শাসন-সূত্রে আবদ্ধ রাখিতে পারে, এমন একটি নিয়ন্ত্রী শক্তি চাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যাহাতে একের সুখ, তাহাতে অন্যের দুঃখ। এইরূপ সাংসারিক স্বার্থবিরোধে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সকলের বিবাদভঞ্জন করিতে পারে, সক-লের উপর আদেশ চালাইতে পারে এবং কাহাকে আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ দেখিলে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারে, কোন স্থলে এরূপ ক্ষমতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সমাজবন্ধনের মূলে রাজার হস্তেই ঈদৃশ ক্ষমতা থাকে। কিন্তু যত সামাজিক উন্নতি হইতে থাকে, তত ধর্ম্ম, রীতি ও নীতিসম্বন্ধীয় শাসনশক্তি লোকসাধারণের হস্তে যায়; এবং পরিশেষে প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বপ্রকৃতিমণ্ডলীর নির্ব্বা-চিত প্রতিনিধিবর্গের প্রতি সমাজরক্ষার ভার অর্পিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজমধ্যে কার্য্যবিভাগ আবশ্যক। অসভ্যাবস্থায় লোকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী নহে; প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনার প্রয়োজনমত সমুদয় কার্য্য করে। একই ব্যক্তি সূত্রধার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মৎস্য-জীবী, শিকারী, গৃহনির্ম্মাতা, ইত্যাদি। ইহাতে কোন কাজই সুচারু-

রূপে সম্পাদিত হয় না, কোন দিকেই উন্নতি হয় না। যদি ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পড়ে, প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মের প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগ দিতে পারে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দক্ষতা ও কৌশল দেখাইতে এবং উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। এইরূপে পরস্পর সাপেক্ষতাগুণে কার্য্যবিভাগদ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের উপকার সাধিত হয়। অতি প্রাচীন কালেই সামাজিক কার্য্যবিভাগপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ও মিসরে এইরূপে জাতিশ্রেণী সংস্থাপিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়। ব্রাহ্মণ বা যাজকগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা করিবেন। ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা দেশ রক্ষা করিবেন। বৈশ্য বা বণিক্ বাণিজ্য ও কৃষির প্রতি মনোযোগ দিবেন। শূদ্র বা দাস অন্যশ্রেণীর লোকের সেবা শুশ্রূষা করিবেন। কিন্তু এ গুলিও কেবল মোটামোটি বিভাগ। ভারতবর্ষে যে সকল বর্ণসঙ্কর জন্মিল, তাহাদিগেরও পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইল। বৈদ্য চিকিৎসক, নাপিত ক্ষৌরকর্ম্মকার, তন্তুবায় বস্ত্রবয়নব্যবসায়ী, ইত্যাদি। এ প্রকার নিয়মে প্রথমে বিশেষ উপকার হয়। যে যাহা শিখিত, আপন সন্তান সন্ততিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক শিখাইত। ইহাতে এক এক বংশের এক এক বিষয়ে দক্ষতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যখন শ্রেণীবন্ধন এরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল যে, এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীতে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকিল না, তখন তিনটী অপকার ঘটিল, (১) সাধারণ সমাজ অপেক্ষা আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি হইল; (২) অন্যশ্রেণীর সহিত বিবাহবন্ধন রহিত হওয়ায় কোন শ্রেণীতে নূতন বল বা প্রতিভা প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ হইল; (৩) যে ব্যক্তি স্বশ্রেণীর ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য শ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সমাজের উন্নতি করিতে পারিত, তাহার পায়ে শৃঙ্খল পড়িল। এই রূপে যে সামাজিক পরস্পর সাপেক্ষতার গুণে কার্য্যবিভাগ-প্রণালীর সৃষ্টি, পরিণামে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত হইল। ঈদৃশ গৃহবিচ্ছেদপূর্ণ সমাজ যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ এবং মিসরই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়তঃ, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে, পরস্পরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থে একটী সাধারণ ভাষা থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি একাকী বনে বনে ভ্রমণ করে, তরুলতা পশুপক্ষী যাহার সহচর, ভাষায়

তাহার প্রয়োজন নাই। কোকিলের কূজন শুনিয়া সে আনন্দে কুহুরব করে, করুক। নিঃশব্দে বসন্ত-বিহগের গীত শ্রবণ করিলেও তাহার ক্ষতি নাই। সমীরণপ্রভাবে মহীরুহব্যূহের স্বনন শুনিয়া তদনুকরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক। নীরব ভাবুক হইলেও তাহার হানি নাই। কিন্তু মনুষ্যসমাজে বাক্যালাপ না করিলে চলে না। পদে পদে অন্যের সাহায্য লইতে হয়। যাহা মনে আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলে কিরূপে সাহায্য মিলিবে? যে যে বস্তুতে যাহার প্রয়োজন আছে, সে সে বস্তুর অক্ষয়ভাণ্ডার তাহার থাকা অসম্ভব। সুতরাং অন্যের নিকটে অভাবপূরণার্থে কথা বলিতে হয়। আবার ভাবিয়া দেখ, আমরা অন্যের নিকটে অনেক সময়ে উৎসাহ, প্রণয়, প্রশংসা চাই; বাক্যদ্বারাই এ সকল ভাল করিয়া ব্যক্ত হয়। যদি অন্য লোককে আপন মতে আনিতে চাই, তাহা হইলেও ভাষাই আমাদিগের প্রধান সম্বল। সাঙ্কেতিক অঙ্গসঞ্চালনদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে মনের ভাব অপর লোকের নিকটে প্রকাশ করা যায়, সত্য। কিন্তু এরূপ সঙ্কেত অতি অল্প বিষয়েই খাটে। ভাষার সাহায্যে মনের ভাব যে প্রকার পরিস্ফুটরূপে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে, সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ হইতে থাকে, এবং ভাষার সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্য সকল উত্তরকালবর্ত্তী লোকের জ্ঞানগোচর হইয়া সামাজিক উন্নতি সংসাধন করে।

চতুর্থতঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রকাশ করা অভ্যাস চাই। অন্যের দোষ মার্জ্জনা করিতে শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু অনেকে একত্র থাকিতে হইলে, অনেক অপরাধ সহ্য করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই প্রকার শিক্ষার অভাবে আফগানস্থান প্রভৃতি দেশে অতি সামান্য কারণে নরহত্যা হয়। দোষীকে ক্ষমা করা যেরূপ একটী সামাজিক গুণ, বিপন্নকে সাহায্য করাও তদ্রূপ আর একটী। ঘটনাসূত্রে কত লোক বিপত্তিজালে নিরন্তর আবদ্ধ হয়, সদয় হইয়া তাহাদিগের মুক্তিসাধনার্থে যত্নশীল হইলেই সামাজিক পরস্পর সাপেক্ষতানুযায়ী কার্য্য করা হয়। এই প্রকার সহায়তালাভপ্রত্যাশাই সমাজবন্ধনের মূল।

পঞ্চমতঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একতা চাই; এক জনের বা এক অঙ্গের দুঃখে অন্য সকলের দুঃখিত হওয়া চাই, এবং সমাজরক্ষাজন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে সকলেরই প্রস্তুত হওয়া চাই। এরূপ যেখানে

নাই, সমাজ বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। গ্রীস ও রোমে বহু-সংখ্যক দাস ছিল। দাসদিগের দুঃখে রাজপুরুষদিগের দুঃখ হইত না, সুতরাং সমাজ রক্ষা করিতেও দাসদিগের প্রবৃত্তি ছিল না। আমা-দিগের বিবেচনায় ইহাই গ্রীস ও রোমের পতনের প্রধান কারণ। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষ ও মিসরে জাতিভেদসংস্থাপন-নিবন্ধন একতাহ্রাস তত্তদ্দেশের স্বাতন্ত্র্যবিলোপের মুখ্য হেতু।

কোন জাতিই অদ্যাপি সামাজিক অবস্থার চরমসোপানে উঠিতে পারে নাই। উক্ত সোপানে উঠিলে, সমাজের নূতন আকার হইবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই পরোপকারার্থ জীবনধারণ করিবেন, আত্মস্বার্থ বিস্মৃত হইয়া অপর মানবগণের মঙ্গলসাধনকার্য্যে দেহমন সমর্পণ করি-বেন। তখন স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা কোথাও থাকিবে না, সর্ব্বত্র ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা বিরাজমান দৃষ্ট হইবে। কবিগণ কল্পনাপথে এই স্বর্ণযুগ দর্শন করিয়াছেন। খ্রীষ্টভক্ত দূরে এই "মিলি-নিয়ম্" দেখেন; দেখেন যে, সমুদয় মনুষ্যজাতি ঈশার প্রেমময় রাজ্যে একপরিবারভুক্ত হইয়াছে এবং অস্ত্র শস্ত্র ভাঙ্গিয়া হল প্রস্তুত হই-তেছে। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ দিব্যচক্ষে কলির অবসানে এই প্রকারে সত্যযুগের আবির্ভাব দেখিতে পান। দর্শনবিৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া অনুমান করেন যে, সমাজের উন্নতিসহকারে সর্ব্বহিত-করী নিঃস্বার্থপ্রবৃত্তিনিচয় নৈসর্গিকনির্ব্বাচনপ্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া এইরূপ সুখময় সময় উপস্থিত করিবে। কিন্তু এখনও এ সকল বহু-দূরের কথা; স্বপ্নবৎ বা আরব্যোপন্যাসবৎ মিথ্যা না হউক, দূরবর্ত্তী নীহারিকাবৎ সামান্য দৃষ্টিপথের অতীত। এখনও সংসার স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। তথাপি যখন মনে হয় যে, এখনকার সুসভ্য ভদ্রলোক হয় ত নরমাংসভোজী রাক্ষসের বংশধর এবং এই মানবকুলে বুদ্ধ ও ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্ববিমোহন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয়।

কিন্তু মনুষ্যের সভ্যতা বলিতে কেবল সামাজিকতা, অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে উন্নতি মাত্র বুঝায় না। যে জ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য জীবকুলশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানের উন্নতিও বুঝায়। জ্ঞানোন্নতির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ইত্যাদি; এ সকল কি গ্রীস, কি ইতালী, কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মিসর, কি কাল্ডিয়া,— কি ফ্রান্স্, কি জর্ম্মনি, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, যেখানে দৃষ্ট হউক,

সেখানেই আমরা সভ্যতার আবির্ভাব স্বীকার করিব। বাল্মীকি, হোমার বা সেক্সপিয়র,—গৌতম, আরিস্ততল্, বা বেকন্—আর্য্যভট্ট, টলেমি, বা নিউটন্,—যেখানে সমুদিত, সেখানে সভ্যতা সপ্রমাণ করিতে অন্য সাক্ষী চাই না।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত গিজো বুঝিয়াছিলেন যে, সভ্যতা বলিতে কেবল "সামাজিক সম্বন্ধবর্দ্ধনই" বুঝায় না, মনুষ্যের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের উন্নতিসাধনও বুঝায়। সমাজ অসম্পূর্ণ হইলেও, যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন ;—

"যদিও সমাজ অন্যস্থানের অপেক্ষা অসম্পূর্ণ, তথাপি মনুষ্যত্ব অধিকতর মহিমা ও প্রভাবসহকারে বিরাজমান। অনেক সামাজিক অধিকারবিস্তার বাকি আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যরূপ নৈতিক ও বৌদ্ধিক অধিকারবিস্তার ঘটিয়াছে ; বহুসংখ্যক লোকের অনেক অধিকার ও স্বত্ব নাই, কিন্তু অনেক বড় লোক জগতের নয়নপথে জাজ্জ্বল্যমান বিরাজিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও শিল্প তাঁহাদিগের প্রভাবিকাশ করিতেছে। যেখানে মনুষ্যজাতি মানবপ্রকৃতির ঈদৃশ মহিমাপ্রদ এই সকল মূর্ত্তির সমুজ্জ্বল আবির্ভাব দর্শন করে, যেখানে এই সকল উন্নতিপ্রদ আনন্দের ভাণ্ডার দেখিতে পায়, সেইখানেই সভ্যতার পরিচয় পাইয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে।"*

মনুষ্য সভ্যতাবর্ত্মে যত অগ্রসর হইতেছে, ততই প্রকৃতিকে স্বীয় করতলস্থ করিতে পারিতেছে। মনুষ্যের যত জ্ঞান ও একতার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই জগতের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব বাড়িতেছে। যে সকল নৈসর্গিক শক্তির সম্মুখে মূর্খ অসভ্যজাতি ভীত ও হতবুদ্ধি, বিদ্যালোকসম্পন্ন সভ্যজাতি বিজ্ঞান ও একতার বলে সে সকল শক্তিকে বশীভূত করিতে পারিতেছেন। সকৌশল ও সমবেত মানবচেষ্টায় হলণ্ডের ন্যায় নিম্ন দেশ সমুদ্রগ্রাস হইতে রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছে, বালুকাময় সুয়েজযোজক বাণিজ্যসুগমতাসম্পাদক পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত হইয়াছে, এবং দুর্লঙ্ঘ্য আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত দ্বারবিশিষ্ট প্রাচীররূপ ধারণ করিয়াছে। দুস্তর জলনিধি উত্তালতরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া যে সকল জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন,

* Guizot's Civilization in Europe.

তাহারা জলযাননির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে। পুরাকালের অগ্নিদেব এখন মনুষ্যের পাচক ও যানবাহক, বায়ুদেব যন্ত্রপেষক ও যানবাহক, সূর্য্যদেব চিত্রকর, এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বিদ্যুৎ সংবাদতরঙ্গবাহিনী দাসী। কবি কল্পনা করিয়াছিলেন যে বরুণ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ রাবণের প্রতাপে তাহার সেবা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনুষ্যের জ্ঞান-প্রভাবে দিক্পালদল সত্য সত্যই তাঁহার সেবা করিতেছে।

প্রসিদ্ধ ইংরেজলেখক বাক্‌ল্ সাহেব বিবেচনা করেন যে, ইউরোপ-খণ্ডের বাহিরে যে সকল প্রদেশ সভ্য হইয়াছে, সে সকল প্রদেশে মনুষ্য বাহ্য জগতের কর্ত্তা না হইয়া তাহার অধীন ছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের সামাজিক অবস্থা বহুকাল একরূপ আছে, এবং এসিয়া ও আফ্রিকার অনেকস্থল হইতে সভ্যতা অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ দেখা যায় না যে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও অন্যস্থলের সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার প্রকৃতিগত বিভেদ আছে। যে হিন্দুরা ইলোরার পর্ব্বত কাটিয়া স্বর্গোপম কৈলাসসমন্বিত গিরিগহ্বরমালা প্রস্তুত করেন, যাঁহারা সঙ্কটসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া সিংহল, বালি, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, যাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার অনেক উন্নতিসাধন করেন, যাঁহারা এই বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টিসম্বন্ধে নানাপ্রকার মত উদ্ভাবন করেন, তাঁহারা যে নৈসর্গিক শক্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া তদনুবর্ত্তী হইতেন, এমন বোধ হয় না; বরং ঋষিদিগের মধ্যে জগদ্বশীকরণের ইচ্ছা প্রবল দেখা যায়। এতদ্দেশে এবং চীনে সামাজিক অবস্থা বহুকাল একরূপ থাকিবার কারণ বোধ হয় এই; যৎকালে ভারতবর্ষের ও চীনের লোকেরা সভ্য হন, তৎকালে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের অধিবাসীরা এত অসভ্য ছিল, যে তাহাদিগের সহিত তুলনায় স্বদেশপ্রচলিত মত ও অনুষ্ঠানগুলির প্রতি তাঁহাদিগের অতিশয় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এবং এই নিমিত্তই বহুকাল তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হন নাই। কোন কোন রাজ্য বা জাতির পতন সজ্ঘটনদ্বারা এসিয়া ও আফ্রিকার অনেক স্থানে সভ্যতার তিরোভাব বা হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বিপ্লব প্রায় সামাজিক কারণের ফল। প্রাচীন রাজ্যমাত্রেই বহুসংখ্যক দাস ছিল। যাঁহাদিগের হাতে আধিপত্য ছিল, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক। এই উভয়ের

মধ্যে পীড়িত ও পীড়ক প্রায় সর্ব্বত্রই এই সম্বন্ধ ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যেখানে এ প্রকার গৃহবিচ্ছেদ, সেখানে সমাজ স্থায়ী হইতে পারে না। ঈদৃশ অবস্থায় বিষময় ফল সর্ব্বত্রই ফলিবে—ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা যেখানেই হউক না কেন। যেমন আফ্রিকায় মিসরের, এসিয়ায় বাবিলন্ প্রভৃতির, তেমনই ইউরোপে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের পতন ঘটিয়াছে। সত্য বটে, গ্রীস ও রোম পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছে। রোম তাহার আইন, গ্রীস তাহার বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য জগতের মঙ্গলসাধনার্থে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষ তাহাদিগের অপেক্ষা কম নহে। ভারতবর্ষ প্রেমময় বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষ আরবদিগকে দিয়া স্বীয় পাটীগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও রসায়ন ইউরোপ-খণ্ডে পাঠাইয়া তথাকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে; এবং ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণদিগের গবেষণা অবলম্বন করিয়াই ভাষা-তত্ত্ববিদ্যার মূল পত্তন হইয়াছে।

বস্তুতঃ প্রকৃতির শক্তি, আদৌ প্রবল হইলেও সভ্যতাবৃদ্ধিসহকারে ক্রমশঃ কমিয়া যায়, যদিও উহা একেবারে শূন্যবৎ বা অগ্রাহ্য হইবার নহে। আদিম মনুষ্য, নিকৃষ্টজীবগণের ন্যায়, নৈসর্গিকনির্ব্বাচনস্রোতের বশবর্ত্তী ছিলেন। সেই আদিমকালীন পিতৃগণ কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করিতে হয় এবং তাহা কি কাজে লাগে কিছুই জানিতেন না। তাঁহা-দিগের দেহ আবরণ করিবার বস্ত্র ছিল না; এবং আশ্রয় লইবার আবাসগৃহ ছিল না। তাঁহারা যখন যেখানে থাকিতেন, তখন তত্রত্য স্বভাবজ ফল মূল আহরণ ও বন্যজীব হনন করিয়া প্রাণধারণ করিতেন। তাঁহাদিগের ধাতুনির্ম্মিত কোন অস্ত্র ছিল না, এবং তাঁহারা কৃষিকার্য্যের কিছুই বুঝিতেন না। তাঁহাদিগকে সাহায্য করে এমন কোন সামাজিক সহযোগী বা পালিত জন্তু ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, উন্নতভাষার অভাবে ততটুকু অন্যকে দিয়া যাইতে পারিতেন না। ঈদৃশ অসভ্য ব্যক্তিগণ যে আপনাদিগের সম্বন্ধে বাহ্যশক্তির কার্য্যপরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইতেন, এমন বোধ হয় না। এই নিমিত্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইত। পরিণামবাদী উয়ালেস্ সাহেব অনুমান করেন যে, এই রূপেই বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। যে সময় হইতে মনুষ্যগণ অগ্নি, বস্ত্র, গৃহ, খাদ্য প্রভৃতির গুণ অবগত

হইয়া তৎসাহায্যে বহির্জগতের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া যে সে মণ্ডলে বাস করিতে শিখিল, সেই সময় হইতে এই সকল জাতীয় লক্ষণের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এই কারণেই তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের অট্টালিকায় যে সকল জাতির মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে অদ্যাপি চিনা যায়। আমাদিগের বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টিই প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এতদ্দ্বারাই প্রকৃষ্টরূপে ঐতিহাসিকপ্রবাহের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। যদি সিন্ধুনদতীরে বা গ্রীস দেশে কাফ্রি জাতি বাস করিত, তাহারা যে আর্য্যজাতির ন্যায় সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারিত, এরূপ প্রত্যয় হয় না। উৎকৃষ্টলক্ষণাক্রান্ত জাতি-সৃষ্টি ব্যতীত, সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃতি আর এক দিকে অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লোক অবসর না পাইলে মানসিক উন্নতি করিতে পারে না, এবং যেখানে স্বভাবতঃ ভূমি এত উর্ব্বরা যে অল্প পরিশ্রমেই পর্য্যাপ্ত আহার্য্য উৎপন্ন হয়, সেখানে সহজেই অবসর মিলে। এই কারণেই অতি প্রচীনকালে নীল, ইউফ্রেতিস্ ও সিন্ধুনদের তীরে সভ্যতার আবির্ভাব। কিন্তু যদিও এইরূপে বাহ্যবস্তুর প্রভাব সভ্যতার উদয়ের সহায় হইয়া থাকে, তথাপি লোকে যে পরিমাণে জগতের ও সমাজের নিয়ম অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে শিখে, সেই পরিমাণে আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিয়া সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে।

আমরা দেখিয়াছি যে সভ্যতার ত্রিবিধ মূর্ত্তি; সামাজিক বা নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ও বাহ্যিক। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত আমাদিগের যে প্রকার সম্বন্ধ, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের বিষয়ে আমাদিগের যে প্রকার জ্ঞান, নৈসর্গিক শক্তিনিচয়ের উপর আমাদিগের যে প্রকার কর্ত্তৃত্ব, তদ্দ্বারাই আমাদিগের সভ্যতার পরিমাণ নির্ণীত হয়। ধর্ম্মের মহৎক্রিয়া, বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী, ও শিল্পের অধিকারবিস্তার, এ সকল সভ্যতার উন্নতিনির্ণয়ের ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড স্বরূপ। কিন্তু আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী জানিতে পারি, সেই পরিমাণেই আমরা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে পারি। আমাদিগের সামাজিক কার্য্যও বিশ্বাসের অনুগত এবং নূতন কিছু না জানিলেও বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং বাহ্যজগতের উপর কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি উভয়ই জ্ঞানোন্নতিসাপেক্ষ। এই নিমিত্ত যাঁহারা

কোন দেশে সভ্যতাবৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে, সেই দেশের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হন।

আদিম মনুষ্য যে ঘোর অসভ্য ছিল, ইহা কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক কয়েকখানির আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, মনুষ্যের ক্রমশঃ উন্নতি না হইয়া অবনতি হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দুদিগের "সত্যযুগের," গ্রীক্‌দিগের "স্বর্ণযুগের," এবং য়ীহুদিদিগের "নন্দনোদ্যানের" উল্লেখ করিয়া আপনাদিগের মত সমর্থন করিতে চাহেন। এ প্রকার তর্ক সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে পূর্ব্বকালীন হিন্দু, গ্রীক্ ও য়ীহুদিদিগের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল সত্য; কিন্তু বোধ হয় আদিমকালের প্রকৃত ইতিবৃত্তের অভাবে, অনুমানের সাহায্যে অতীতের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে গিয়া তাঁহারা বৃদ্ধবয়সের বিজ্ঞতা ও তপস্বিভাব প্রাচীনকালের প্রতি আরোপ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে যে ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, আসিরিয়া, গ্রীস, ইতালী, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যজাতিগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ আপন আপন সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যজাতিগণের ইতিবৃত্তও এই প্রকার। অদ্যাপি পৃথিবীতে এমন অসভ্য জাতি আছে, যাহারা এখনও প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে, যাহারা এখনও অগ্নির প্রয়োগ শিখিতে পারে নাই, এবং যাহারা এখনও বিবাহবন্ধন জানে না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা দেখাইতেছে যে, মনুষ্য প্রথমে প্রস্তরাস্ত্র, পরে তাম্র, পিত্তল বা কাংস্যনির্ম্মিত অস্ত্র, এবং পরিশেষে লৌহ-অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্যাও ক্রমোন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করে। যে সকল শব্দ এক্ষণে উন্নত মানসিক ভাববোধক, সে সকল আদৌ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থবাচক ছিল। এইরূপে চারিদিকে উন্নতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রত্যক্ষকে সকল জ্ঞানের মূল বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, একটী মঙ্গলকর তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে মানবসমাজের কত কালের পরিশ্রম লাগিয়াছে, এবং কত আস্তে আস্তে মনুষ্যের উন্নতি হইয়াছে। সত্য বটে, সময়বিশেষ বা দেশবিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা কোন কোন স্থলে অবনতি দেখিতে পাই; কিন্তু কিঞ্চিদধিককাল ব্যবধানে সমগ্র মানবজাতির প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিলে উন্নতিই দৃষ্ট হয়।

জাতিবিশেষের উদয়াস্ত আছে, কিন্তু একজাতির হস্ত হইতে অপর জাতি উন্নতিনিশান গ্রহণ করিয়া নেতৃরূপে অগ্রসর হয়। প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাচীন নেতা ভারতবর্ষ, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রাচীন নেতা মিসর। মিসরের হস্ত হইতে পশ্চিমের নেতৃত্বভার ক্রমে ক্রমে ফিনিসিয়া, গ্রীস ও রোমের হাতে যায়। পরে আরবেরা ইউরোপ ও ভারতবর্ষ উভয় স্থান হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া পূর্ব্বপশ্চিম উভয় খণ্ডের নেতা হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিগণ এক্ষণে আরবদিগের পদে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন সমুদয় জাতি অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। সমাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পণ্ডিতগণের মতগুলি প্রাচীন পণ্ডিতগণের মত অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে; কিন্তু এই মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাদিগের যে কতকাল লাগিবে, বলা যায় না। এই কারণেই বলি যে, সভ্যতার চরমসীমা হইতে তাঁহারা অদ্যাপি অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছেন।

[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ।*

মনুষ্য সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়া বাহ্য জগতের প্রভু হইয়া বসিয়াছেন। এখন তিনি অগ্নিকে পূজা করা দূরে থাক, তাহাকে পাচক ও পরিচারক করিয়া তুলিয়াছেন; তাহাকে দিয়া ভক্ষ্য প্রস্তুত করান, প্রয়োজনমত আলোক জ্বালান, কল ঘুরান, এমন কি গাড়ী ও নৌকা পর্য্যন্ত টানান। তাঁহার কৌশলে বায়ুও বশীভূত হইয়াছে। বায়ু এখন পেষণযন্ত্র (১), জলযান ও ব্যোমযান চালাইতে নিযুক্ত। এ দিকে দিবাকর চিত্রকরের কার্য্য পাইয়াছেন (২), এবং ইন্দ্রের প্রিয় বিদ্যুৎ মানবসন্তানের আদেশে দেশে দেশে সংবাদ বহিয়া বেড়াইতেছেন (৩)। বৃষ্টি সময়ে হউক বা না হউক, খাল ও কূপ খনন করিয়া ক্ষেত্রে

---

* Works consulted—*Buckle's Works, Mahaffy's Lectures on Primitive Civilizations, Smith's History of Greece, &c.*

(১) Wind-mill.

(২) Photograph.

(৩) Electric Telegraph.

সলিলসিঞ্চনের উপায় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক মনুষ্য আবশ্যক শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোথায় তিনি পর্ব্বত কাটিয়া পথ করিতেছেন (৪), কোথাও সমুদ্র তাড়াইয়া বাসস্থান করিতেছেন (৫), কোথাও শুষ্কস্থলে সাগর করিতেছেন (৬), কোথাও জলের নীচে রাস্তা করিতেছেন (৭)। উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সংবলিত ভীষণ সিন্ধু সভ্য নরজাতির যাতায়াতের বর্ত্ম হইয়াছে। কি সূর্য্যসন্তপ্ত উষ্ণমণ্ডল, কি তুষারাবৃত হিমমণ্ডল, সর্ব্বত্রই বাসগৃহ, পরিধেয়, আহারসামগ্রী, ও বাতাতপ নিয়মিত করিয়া মনুষ্য সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে সক্ষম হইতেছেন। তাঁহার প্রতাপে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; এবং যে সকল বিস্তীর্ণ ঘন বিজন কাননভূমিতে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিত, সে সকলও বিলুপ্ত হইতেছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গো, মহিষ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পশু সকল মানবের দাস হইয়াছে; এবং যে সকল পক্ষী কোনরূপে কার্য্যোপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে সকলও অনেক পরিমাণে মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের প্রভুত্ব বাড়িয়াছে। মানবগণ যত প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইতে পারিয়াছেন, ততই বাহ্য পদার্থ সকল ইচ্ছার বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া জগতের সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ চলিতেছে; আরও বহুকাল চলিবে। কিন্তু ক্রমে মনুষ্যের জয়লাভ ও অধিকারবৃদ্ধি হইলেও, বাহ্য জগৎ মানবজীবনের ঘটনাস্রোত বহুপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। মানবেতিহাসে বহির্জ্জগতের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা কয়েকটী কথা বলিব।

ভূমণ্ডলের পুরাবৃত্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, যে দেশবিশেষের অবস্থান, তথাকার শীতোষ্ণতা, ভূমির উর্ব্বরতা ও সাধারণ খাদ্যের সহিত অধিবাসীদিগের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ বাহ্য কারণগুলিও পরস্পরনিরপেক্ষ নহে। কোন দেশে যে প্রকার খাদ্য জন্মে, তাহা সেখানকার ভূমি

---

(৪) Mont Cenis Tunnel.
(৫) Holland.
(৬) Suez Canal.
(৭) Thames Tunnel and projected Gibraltar and Dover Tunnels.

ও শীতোষ্ণতা-সাপেক্ষ। শীতোষ্ণতাও দেশের অবস্থান-সাপেক্ষ। আমরা প্রথমে শীতোষ্ণতার কার্য্য প্রদর্শন করিব।

শীতে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়; গ্রীষ্মে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহার কারণ আছে। শারীরিক কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত মনুষ্যশরীরে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাপ থাকা আবশ্যক। কিন্তু চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর তাপদ্বারা দৈনিক তাপের পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়। ক্রমাগত শীতল-বায়ু-সংস্পর্শে শরীরের তাপ কমিয়া যায়, এবং ক্রমাগত উষ্ণ-বায়ু-সংস্পর্শে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। (৮) এই জন্য শীতপ্রধানপ্রদেশে লোকে শরীরের নিয়মিত তাপ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, কারণ যে কোনপ্রকার শরীরসঞ্চালন দ্বারাই দেহাভ্যন্তরে তাপ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্তই গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে পরিশ্রম করা কষ্টকর বোধ হয়। সুতরাং শীতোষ্ণতার তারতম্যানুসারে নিতান্ত সামান্য ফল ফলিতেছে না। শীতে মনুষ্যকে পরিশ্রমপ্রিয় করে; গ্রীষ্মে মনুষ্যকে অলস করে। শীতে মনুষ্যকে ক্রমাগত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, গ্রীষ্মে মনুষ্যকে বিশ্রাম অন্বেষণ করিতে শিখায়। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইতিহাস পাঠ কর, এই কথার সত্যতা পদে পদে প্রতিপন্ন হইবে। ইউরোপখণ্ডের সহিত এসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রদেশসকলের তুলনা কর। ইউরোপ পরিশ্রমের আকর, আফ্রিকা ও এসিয়া আলস্যের আবাসভূমি। লোকের পারলৌকিক বাঞ্ছাতেও বাহ্যজগতের ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদিগের মোক্ষ নির্ব্বাণ বা লয়; ইউরোপের মোক্ষ অনন্ত উন্নতি।

অনেক সময় দেখা যায় যে, সমতলপ্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা পার্ব্বতীয় প্রদেশের লোক শক্ত ও পরিশ্রমপ্রিয়। ইহারও কারণ সহজে বুঝা যায়। সমতলপ্রদেশাপেক্ষা পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকল উচ্চ বলিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল; সুতরাং তথাকার অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত পরিশ্রমপ্রিয় ও তন্নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত বলবান্ হইবার কথা। মিড্ (৯) ও পারসিকদিগের যদিও ভাষা ও ধর্ম্ম এক ছিল, তথাপি সমতলপ্রদেশবাসী মিডেরা পরিশেষে পার্ব্বতীয় প্রদেশবাসী

---

(৮) See *Carpenter's Human Physiology, 6th Ed. p.* 429.

(৯) Medes.

পারসিকদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশের প্রতি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন কি? বাঙ্গালির সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের অধিবাসীদিগের তুলনা কর। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাঙ্গালা অপেক্ষা অধিক শীত হয়, এখান অপেক্ষা তথায় অধিক কাল শীত থাকে। এখানকার লোক অপেক্ষা তাহারা শক্ত, সবল ও পরিশ্রমপ্রিয়। মহারাষ্ট্র পার্ব্বতীয় প্রদেশ, সেখানকার অধিবাসীরাও অপেক্ষাকৃত সাহসী ও পরিশ্রমী। (১০)

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। শরীরে অধিক উত্তাপ লাগিলে শারীরিক জলীয় পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে বাস্পাকারে দেহ হইতে নির্গত হয় ও সেই সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণ তাপও বহির্গত হয়। যদি চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুতে অধিক জলীয় বাস্প থাকে, তাহা হইলে দেহ হইতে বাস্পনির্গমনের বাধা জন্মে, স্থতরাং তাপনির্গমনেরও প্রতিবন্ধকতা হয়। (১১) এই কারণে শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে যত তাপ সহ্য করা যায়, সজল ও উত্তপ্ত বায়ু মধ্যে তত সহ্য করা যায় না। (১২) এই নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে যে সজল ও উত্তপ্তবায়ুবিশিষ্ট দেশের অধিবাসীরা যেরূপ অলস ও বিশ্রামপ্রিয়, শুষ্ক ও উত্তপ্তবায়ু-বিশিষ্ট প্রদেশবাসীরা সেরূপ নহে।

ভূমির উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে উত্তাপ ও জলের উপর নির্ভর করে। যে সকল দেশ উষ্ণ ও সলিলসিক্ত, সেই সকল দেশের ভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা; যেখানে এই তুইটীর মধ্যে একটীর অভাব আছে, অথবা যেখানে এই তুইটীর প্রয়োজনানুরূপ মিলন সজ্ঘটিত হয় নাই, সেখানকার ভূমি অনুর্ব্বরা। এই কারণেই সপ্তসিন্ধু, অনুগঙ্গ প্রদেশ, নীলনদের তীর, ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর সন্নিহিত স্থান, উর্ব্বরতা জন্য প্রসিদ্ধ। এই কারণেই তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ও হিমমণ্ডলের অন্তর্গত স্থান সকল উর্ব্বরতা বিষয়ে নিকৃষ্ট। এক্ষণে বিবেচনা কর, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা তাপবৃদ্ধিকারী দ্রব্য অধিক খাইতে

(১০) "The inhabitants of the dry countries in the north, which in winter are cold, are comparatively manly and active. The Mahrattas inhabiting a mountainous and unfertile region, are hardy and laborious."—*Elphinstone's History of India.*

(১১) See *Carpenter's Human Physiology, 6th Ed. p.* 444.

(১২) *Ibid p.* 432.

ভাল বাসিবে না; সুতরাং মাংস অপেক্ষা ফল মূলই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য হইবে। শীতপ্রধান দেশের লোকে তাপবৃদ্ধিকারী তৈলাক্ত অর্থাৎ বসাযুক্ত মাংস আহার করিতে অনুরাগ প্রকাশ করিবে। যে সকল মাদক দ্রব্যে শরীর উষ্ণ করে, সে সকলও গ্রীষ্মপ্রধান দেশাপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে প্রিয় পদার্থ হইবে। এতদ্দেশবাসীদিগের সহিত ইউরোপখণ্ডের অধিবাসীদিগের তুলনা করিলেই, এ সকল কথার সত্যতা প্রতীত হইবে। আবার মনে কর, যে উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত সুতরাং উর্ব্বরা, সেখানে অল্প পরিশ্রমেই আবশ্যক আহার্য্য উদ্ভিদ্ সকল উৎপন্ন হইবে। এই কারণেও অল্প পরিশ্রমই লোকের অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, ও তাহাদিগের আলস্য বৃদ্ধি হইবে। শীতপ্রধান প্রদেশে ভূমির গুণে ভক্ষণীয় উদ্ভিদ্ সকল যে কেবল অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইবে, এরূপ নহে; অধিবাসীরা মাংসপ্রিয় বলিয়া মৃগয়াপ্রিয় হইবে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সাহসী ও সবল হইবে। যদি কোন উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত না হয়, সে দেশের ভূমি উর্ব্বরা হইবে না; সুতরাং তথাকার লোকের অধিক পরিশ্রম ও যত্নসহকারে ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে এবং অল্পজন্মা দেশে লব্ধ খাদ্য অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যও অনেক প্রয়াস পাইতে হইবে। সুতরাং অধিবাসীরা শক্ত ও সবল হইবার কথা। ইহার দৃষ্টান্তস্থল আরব দেশ। আরব উষ্ণ দেশ বটে, কিন্তু সেখানে বড় জলকষ্ট। সেখানে বৃহৎ নদ নদী, হ্রদ নাই। সুতরাং সেখানে উর্ব্বরা ভূমি প্রায় নাই। এজন্য ভক্ষ্যসংগ্রহ নিমিত্ত আরবদিগকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এই কারণে তাহারা পরিশ্রমী, শক্ত ও সাহসী। আরবের বায়ু শুষ্ক; ইহা অন্য প্রকারেও অধিবাসীদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইহাতে সজলবায়ুবিশিষ্ট উষ্ণপ্রদেশের ন্যায় আরবে শ্রমকাতরতা সমুৎপন্ন হইতে পারে নাই। স্থানমাহাত্ম্যে আরবের অধিবাসীরা এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই, তাহারা এক সময়ে সিন্ধুনদ হইতে আট্লান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, ভারতমহাসাগর হইতে ফ্রান্সের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত মুসলমান জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। যেরূপ পার্ব্বত্য প্রদেশে কখন কখন বহুদিন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জলরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, পরে সামান্য কারণে কোন দিক্ ভাঙ্গিয়া প্রচণ্ডবেগে বহির্গত হয় ও অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ বহুকাল পর্য্যন্ত আরবে যে মানবশক্তি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়াছিল, মহম্মদের আদেশে সনাতন

ধর্ম্ম প্রচারার্থে সেই শক্তি একবার স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমণ্ডল প্লাবিত করিতে সবেগে ছুটিয়াছিল। পারসিক সাম্রাজ্য ও পূর্ব্বরোমক সাম্রাজ্য তাহার প্রভাবে বিলুপ্ত হয়। এসিয়ার পশ্চিমভাগ, আফ্রিকার উত্তরখণ্ড, ইউরোপের স্পেন ও পর্ত্তুগাল, অল্পদিনেই আরবদিগের করতলস্থ হয়। কে বলিবে একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই আরবের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে? এক্ষণে অগ্নিশিখা বা ধূম দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য; কিন্তু আগ্নেয়গিরি বহুকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও কখন কখন আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সলিলসিক্ত, সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা, যথা নীলনদের উপত্যকা, ইউফ্রেটীস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর তীরবর্ত্তী ভূমি, অনুগঙ্গ প্রদেশ, সপ্তসিন্ধু ইত্যাদি। আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্বাংশে মিসরদেশ দিয়া নীলনদ প্রবাহিত, নদের উভয়তীরেই কিয়দ্দূরে পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে কয়েক ক্রোশ বিস্তৃত উপত্যকা। পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয় অতিক্রম করিলেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও বালুকারাশি দৃষ্ট হইবে। মিসরে প্রায় বৃষ্টি হয় না। কেবল বর্ষাকালে নীলনদের জল বৃদ্ধি পাইয়া উপত্যকা প্রদেশ প্লাবিত করে, তাহাতেই ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা পায়। আষাঢ় মাস হইতে জল বাড়িতে আরম্ভ হয়, শতদিন বৃদ্ধির সময়, এই সময়ে প্রায় ১৩। ১৪ হাত জল বাড়ে। অনন্তর জল কমিতে থাকে, এবং প্রায় চারি মাসে নদের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে। বর্ষার জল হইতে যে পলল পড়ে, তাহাতেই প্লাবিত ভূমি উর্ব্বরা হয়; এবং জল সরিতে সরিতেই মিসরবাসীরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করে। নীলনদ মিসরের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ করিয়া উত্তর সীমা পর্য্যন্ত যাইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। সুতরাং নীলনদের উপত্যকা সঙ্কীর্ণ হইলেও অতি দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন। জলপথে সর্ব্বত্রই যাতায়াতের সুবিধা। বৎসরের মধ্যে আট মাস উত্তর দিক্ হইতে বাতাস বহিতে থাকে, ইহাতে পালভরে স্রোতের প্রতিকূলে অনায়াসে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়া যায়। স্রোতের সাহায্যে দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করাও সহজ। জল বায়ু সর্ব্বত্রই সমান। ভূমিকম্প প্রভৃতি ভয়ঙ্কর নৈসর্গিক ঘটনার উৎপাতও প্রায় নাই, পীরামিড্ প্রভৃতির রক্ষাই ইহার সামান্য প্রমাণ নহে। নদের জলপ্লাবনের গুণে উপত্যকা প্রদেশে বন্য জন্তুর দৌরাত্ম্য নাই। মিসরের পশ্চিমে বৃহৎ মরুভূমি, পূর্ব্বে লোহিতসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে আফ্রিকার

অসভ্য জনপদসকল। সুতরাং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় মিসরবাসী-দিগের অধিক ছিল না। এক্ষণে বিবেচনা কর, এই সকল কারণে প্রাচীনকালে, দেশের কিরূপ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ষান্তে কৃষিকার্য্য করিবার যেরূপ সুবিধা হইত, তাহাতে সাধারণতঃ লোকে কৃষিজীবী হইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ, জলপ্লাবনে ক্ষেত্র সকল যেরূপ একাকার হইয়া যাইত, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভূমি নির্ণয় নিমিত্ত ভূমিপরিমাণ করিতে জানা আবশ্যক হইত। তৃতীয়তঃ, কোন্ সময়ে নীলনদের জল বাড়িতে ও কোন্ সময়ে কমিতে আরম্ভ হয়, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত নক্ষত্রপুঞ্জ সকলের আবির্ভাব, তিরোভাব বা অবস্থান নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হইত। এই সকল কারণে অতি প্রাচীনকালে মিসরে কৃষিবিদ্যা, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চারম্ভ হইয়াছিল, এবং দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

আবার ভাবিয়া দেখ, সমুদায় দেশটী একই উপত্যকা: মধ্যে কোন মরুভূমি, পর্ব্বত বা নদী থাকিয়া দেশটীকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নাই; সর্ব্বত্র গমনাগমনেরও সুবিধা ছিল। সুতরাং সমুদায় দেশটী একই রাজ্য হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাই ঘটিয়াছিল। পলল পড়িয়া ভূমি যে প্রকার উর্ব্বরা হইয়াছিল, তাহাতে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপন্ন হইত। এ কারণে অনেক লোকে আহারান্বেষণকষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা করিবার অবসর পাইয়া-ছিল। ইহা হইতেই মিসরের পুরাতন সভ্যতার উৎপত্তি; ইহা হইতেই খ্রীষ্ট জন্মের তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের মহিমা প্রকাশ। আর দেশের চতুর্দ্দিক্ যে ভাবে রক্ষিত ছিল, তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণ দ্বারা আভ্যন্তরিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে নাই; বিশেষতঃ উপত্যকার সমুদায় অধিবাসিগণ একই রাজার অধীন থাকাতে সহসা মিসর আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। এক স্থল হইতে অন্য স্থলে সর্ব্বদা যাতায়াতের সুবিধা থাকাতে সর্ব্বত্রই লোকের শিক্ষা প্রায় একরূপই ছিল। ইহা দেখিয়া প্রাচীন গ্রীকেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। গ্রীসে আথেন্স্, স্পার্টা, আর্কেডিয়া, বিওসিয়া, থেসালী, ইপাইরস্ প্রভৃতি স্থান সকলের সভ্যতার তারতম্য ছিল; কিন্তু এ সকল স্থান পরস্পর যত দূরবর্ত্তী, তদপেক্ষা অধিকতর দূরবর্ত্তী প্রদেশের মিসরবাসীদিগের মধ্যে সভ্যতা-

সম্বন্ধে কোন বিভেদ দৃষ্ট হইত না। নীলনদের উপত্যকা যেরূপ শস্যশালিনী ছিল, তাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তু জন্য মিসরবাসীদিগের অন্য দেশের অপেক্ষা রাখিতে হইত না। এজন্য তাহারা বহির্বাণিজ্য করিতে বা বিদেশে যাইতে ভাল বাসিত না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা উদ্ভিদ্‌ভোজী হয়। মিসর এ বিষয়ের একটি প্রমাণ। কিন্তু মিসরের ন্যায় যেখানে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপন্ন হয়, সেখানে আর একটি ফল ফলে। একে ত গ্রীষ্ম বলিয়া বস্ত্রের জন্য লোকের বিশেষ ভাবনা করিতে হয় না, তাহাতে আবার খাদ্য অনায়াসে লভ্য হইলে শ্রমজীবী লোকে বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে চিন্তিত হয় না। এইরূপে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। কিন্তু শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বাড়িলে তাহাদিগের বেতনের হার কমে; সুতরাং তাহারা অনেক ধন উপার্জ্জন করিতে পারে না, কোনরূপে মাত্র জীবন ধারণ করিতে পারে। এ দিকে বহুসংখ্যক লোকের শ্রম আয়ত্ত করিতে পারিয়া ধনীদিগের বিলক্ষণ লাভ হয়। এইরূপে এক দিকে যেমন শ্রমজীবীরা নিঃস্ব হইতে থাকে, তেমনই অপরদিকে কতকগুলি লোকের অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকে। অর্থবলে শেষোক্ত দলের অত্যন্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়; দেশের শাসনভার তাহাদিগের হাতে যাইয়া পড়ে; এবং তাহারা সমাজের মধ্যে উচ্চশ্রেণী বা প্রধান বর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। সভ্যতার ইতিহাসলেখক বাক্‌ল্ সাহেব বিবেচনা করেন যে, এইরূপেই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং মিসরের যাজক ও সৈনিকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। যেখানে সাধারণ লোকে এ প্রকার নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীন, সেখানে শূদ্রদিগের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার হইবে, এবং রাজা স্বেচ্ছাচারী বা উচ্চশ্রেণীর অনুগত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষে ও মিসরে রাজা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন, কেবল তাঁহার ব্রাহ্মণ বা যাজকদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করিতে হইত।

নীলনদের উপত্যকা যেরূপ উর্ব্বরা, ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ প্রায় সেইরূপ। মিসরের ন্যায় এখানেও বৃষ্টি অল্প হয়, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে আর্ম্মাণদেশের পর্ব্বতে যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহাতে নদীদ্বয় পূরিয়া যায়, ও জলপ্লাবন উপস্থিত হয়। ইহাই তাহাদিগের তীরবর্ত্তী প্রদেশের উর্ব্বরতার কারণ। সামান্য শ্রমেই

সেখানে যথেষ্ট শস্য জন্মে। এই নিমিত্তই অতি প্রাচীনকালে তত্রত্য ব্যাবিলন্ রাজ্য সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। নদীদ্বয় রাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরিখা স্বরূপ ছিল; দক্ষিণে অনতিদূরেই সমুদ্র; উত্তরে পার্ব্বত্য আর্ম্মাণদেশ। সুতরাং দেশরক্ষাকার্য্যও সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত। ব্যাবিলনের সভ্যতার পরিচয় দিতে বর্ত্তমানকালে পীড়ামিড্ প্রভৃতির ন্যায় প্রকাণ্ড কোন মন্দির নাই; কিন্তু এক সময় সেখানে চারি শত হস্তাধিক উচ্চ একটি দেবমন্দির ছিল। ব্যাবিলনে প্রস্তর পাওয়া যাইত না, সুতরাং ইষ্টকনির্ম্মিত সৌধসকল বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলনদের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে যথেষ্ট প্রস্তর পাওয়া যাইত, সুতরাং তন্নির্ম্মিত মিসরের কীর্ত্তি এতকাল স্থায়ী রহিয়াছে। এক্ষণে মৃত্তিকা খনন করিয়া ব্যাবিলন্ রাজ্যের যে সকল স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য কার্য্যের উদ্ধার হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আফ্রিকার উত্তরে মিসর ভিন্ন আর কোন স্থানে অধিক পরিমিত অবিচ্ছিন্ন উর্ব্বরা ভূমি নাই; এবং অতি প্রাচীন কালে মিসর ভিন্ন আর কোথাও স্বতঃ সভ্যতার উৎপত্তি হয় নাই। এসিয়াখণ্ডে ইউ-ফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষে সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে, তাতারে চক্ষুস নদকূলে, এবং চীনে ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো সন্নিহিত প্রদেশে, বিস্তীর্ণ উর্ব্বরা ভূমি ছিল। সুতরাং পুরাকালে চক্ষুস নদকূলে আর্য্য-সভ্যতার উদয়; এবং ভারতবর্ষে ও চীনেও বিলক্ষণ সামাজিক ও মানসিক উন্নতি হইয়াছিল। উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও একটি পর্ব্বতশ্রেণী, এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ ও একটি শৈলমালা; এই সকল কারণে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইয়া সভ্যতাবৃদ্ধির উপায় হইয়াছিল। আর এ দেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত এত অধিক জন্মিত, যে এখানকার অধিবাসীরা বিদেশের সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতে তত প্রয়াসী হন নাই। উত্তর দিক্ ব্যতিরিক্ত আর কোন দিক্ দিয়া চীন আক্রমণ করিবার সুবিধা ছিল না। সেই দিকেই চীনেরা বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহুকাল পর্য্যন্ত চীনে ও ভারতবর্ষে রীতি নীতি অধিক পরিবর্ত্তিত হয় নাই দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হন। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা আবশ্যক যে, কোন একটি অনুষ্ঠান বহুবিস্তীর্ণস্থান-ব্যাপী হইলে বহুকালস্থায়ী হয়; এবং চীন ও ভারতবর্ষ উভয়ই বৃহৎ

দেশ, বিশেষতঃ উভয় দেশের অধিবাসীরাই স্বদেশে ভোগ্য বস্তু পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া বিদেশের সহিত অধিক সংস্রব রাখেন নাই; সুতরাং অপর দিক হইতে কোন পরিবর্ত্তন-স্রোত আসিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে ফিনিসিয়া দেশ অবস্থিত। উহার বিস্তৃতি ও দৈর্ঘ্য উভয়ই অল্প। এক পার্শ্বে উচ্চ লিবেনন্ পর্ব্বত, অপর পার্শ্বে সমুদ্র। সমুদ্রে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়, লিবেনন্ পর্ব্বতে বড় বড় বৃক্ষ জন্মে। সুতরাং মৎস্য ধরিবার জন্য নৌকা নির্ম্মাণ করিতে অধিবাসীদিগের সহজেই প্রবৃত্তি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে বাত্যাবশে সাইপ্রস্ দ্বীপ ও নীলনদের মুখ পর্য্যন্ত তাহারা কখন কখন উপস্থিত হইবে, বিচিত্র নহে। এই রূপে ক্রমে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতে তাহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইবে, এবং তাহারা সাইপ্রস্ দ্বীপ হইতে তাম্র ও মিসর হইতে শস্যাদির বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। লিবেনন্ পর্ব্বতেও অনেক বহুমূল্য ধাতু পাওয়া যাইত, ইহাতেও তাহাদিগের বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবার সুবিধা হইয়াছিল, বোধ হয়। ব্যাবিলন্ ও মিসর প্রাচীন কালে যেরূপ সভ্য হইয়াছিল, এক রাজ্যের উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত অপর রাজ্যে লইয়া গেলে বিলক্ষণ ব্যবসায় চলিবার কথা। অবস্থান-গুণে ফিনিসিয়ার অধিবাসীরা এই ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল। ক্রমে ফিনিসিয়ার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয়। কোন কোন স্থানে কোন ধাতু বা বাণিজ্যদ্রব্যবিশেষ সংগ্রহ নিমিত্তও তাহাদিগের তথায় থাকিবার প্রয়োজন হয়। ক্রমশঃ তাহারা সাইপ্রস্, ক্রিট্, গ্রীস, আফ্রিকা ও স্পেন, প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সন্নিবেশিত করে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের হিসাব রাখিবার কোনরূপ সহজ চিহ্ন ব্যবহার করা তাহাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। মিসরে চিত্রসদৃশ (১৩) এক প্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল, ব্যাবিলনে শরমুখ-সদৃশ (১৪) আর এক প্রকার বর্ণমালা ছিল। ফিনিসিয়াবাসীরা সঙ্ক্ষেপে হিসাব রাখিবার নিমিত্ত আরও সরল বর্ণমালা সৃষ্টি করিলেন। গ্রীক্ ও য়ীহুদিরা ফিনিসিয়া হইতেই অক্ষর প্রাপ্ত হন, এবং

(১৩) Hieroglyphics.

(১৪) Cuniform writings.

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্য জাতি ও তাহাদিগের সন্তানসন্ততিগণ ও মুসলমান ও য়ীহুদিরা অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত ফিনিসিয়ার বর্ণমালাই ব্যবহার করিতেছেন। ফিনিসিয়াবাসীরা যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে কার্থেজ্ই উত্তরকালে বিশেষ বিখ্যাত হয়।

এসিয়াখণ্ড হইতে এক্ষণে ইউরোপের অভিমুখে চল। ইউরোপীয় সভ্যতার মূল গ্রীস দেশ। গ্রীস হইতেই ইউরোপের অন্যান্য জাতি দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহা-কাব্যে হোমর তাঁহাদিগের আদর্শ, গীতিকাব্যে পিণ্ডার, নাটকে সফক্লিস্ ও ইস্কিলস্। হেরোডোটস্ ইতিহাস রচনার পথপ্রদর্শক। সক্রেটিস্ ও প্লেটো দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক। আরিষ্টটল্ বৈজ্ঞানিক প্রণালী সংস্থাপক। ইউক্লিড্ জ্যামিতির, আর্কিমিডিস্ পদার্থবিদ্যার, হিপার্কস্ ও টলেমি জ্যোতিষের, এবং হিপক্রেটিস্ ভৈষজ্যবিদ্যার দীক্ষাগুরু, ফিডিয়াস্ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কার্য্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, এবং এপিলিস্ চিত্রকরদলের উন্নতিপথপ্রদর্শক। এক্ষণে দেখা যাউক, বাহ্য জগতের প্রভাবে গ্রীসে কিরূপ ফল ফলিয়াছে।

গ্রীসের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি কর। দেখিবে গ্রীস ও এসিয়া মাই-নরের মধ্যবর্ত্তী সাগরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি পরস্পর এত নিকটবর্ত্তী যে সমুদ্রপথে একটি দেখিতে দেখিতে প্রায় আর একটিতে উপস্থিত হওয়া যায়। গ্রীসের নিকট হইতে দ্বীপাবলীর আরম্ভ; এবং সাগর-মধ্যে যেখানে চাহিবে, সেখান হইতেই কোন শৈল বা দ্বীপ দেখিতে পাইবে; এবং এক বন্দর হইতে অল্পদূরে অন্য বন্দর লক্ষিত হইবে। এরূপ অবস্থায় গ্রীসের অধিবাসীরা যে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য অবলম্বন করিতে ভাল বাসিবে, এবং বাসযোগ্য দ্বীপগুলি ও এসিয়া মাইনর তাহাদিগের কর্ত্তৃক উপনিবেশিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। এ স্থলে অর্ণবযানে পর্য্যটন করিবার আর একটি সুবিধা ছিল। হেলেস্পন্ট্ হইতে ক্রিট্ দ্বীপ পর্য্যন্ত নিয়মিত বাণিজ্যবায়ু বহিত।

গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। তাহাদিগের দ্বারা অল্পস্থল মধ্যেই অনেকপ্রকার জলবায়ুর পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়। আথেন্সে অনেক যত্ন না করিলে দক্ষিণ প্রদেশের সুখাদ্য ফল সকল জন্মে না। কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ দিকে চল। আর্গোলিসের উপকূলে কমলা ও কলম্ব লেবুর বিচিত্র উদ্যান দৃষ্ট হইবে। সে স্থল হইতে

কয়েক ঘন্টা মধ্যে এমন স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, যেখানে দ্রাক্ষা-লতাও বাঁচে না। এ দিকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেসেনি প্রদেশে খর্জ্জুর পর্য্যন্ত পাকিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, নিকটে নিকটে, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ায়, পরস্পর বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবার কথা। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত মধ্যে থাকায়, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থলপথে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, কুত্র বা অসম্ভব। আটিকা ও বিওসিয়ার মধ্যে পর্ব্বত, এবং এতদুভয় থেসালী হইতে চারি পাঁচ হাজার হাত উচ্চ শৈলমালা দ্বারা বিভক্ত, উক্ত শৈলমালামধ্যে বিখ্যাত গিরিসঙ্কট থর্ম্মাপলী। করিন্থ যোজক দিয়া দক্ষিণস্থ উপদ্বীপ যাইতেও পাহাড় বাধে; এবং উক্ত উপদ্বীপের মধ্য দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থলপথে যাওয়া অপেক্ষা জলপথে গমন অনেক সহজ। গ্রীসদেশের সঙ্গে সমুদ্র সর্ব্বত্র এরূপ ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, সকল স্থান হইতেই উহা নিকটবর্ত্তী। এই প্রকার নানা কারণে সাগর-পর্য্যটনপ্রবৃত্তি গ্রীকদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ঈদৃশ অনুমান করা অন্যায় নহে। উত্তরকালে গ্রীকদিগের যেরূপ বাণিজ্যবৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাহারা ভূমধ্যসাগরের চতুঃপার্শ্বে যাদৃশ উপনিবেশাবলী সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের দেশের অবস্থা হইতেই এই রূপে তাহার সূত্রপাত হয়।

গ্রীসের পূর্ব্ব পার্শ্বে যেরূপ বন্দর ছিল, ও যেরূপ গমনাগমনের ও বাণিজ্য করিবার সুবিধা ছিল, পশ্চিম পার্শ্বে সেরূপ ছিল না। পশ্চিম পার্শ্বের উপকূল দুরারোহ ও তথাকার বায়ু অসুখকর। সুতরাং পশ্চিম পার্শ্ব, রোম ও আথেন্স্ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলেও, তাহা পূর্ব্ব পার্শ্বের ন্যায় সভ্য হইতে পারে নাই। আথেন্স্ যে আটিকা প্রদেশের রাজধানী, সে আটিকায় আবশ্যক শস্য জন্মিত না; সুতরাং আথেন্স্-বাসীরা খাদ্যসংগ্রহের জন্য বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইতেন। যে সকল স্থান স্পার্টার অধীন ছিল, সেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। এই কারণেই বোধ হয় আথেন্স্‌বাসীরা জলপথে যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, স্পার্টাবাসীরা সেরূপ পারেন নাই।

গ্রীসের কোথাও সমতল ক্ষেত্র, কোথাও উচ্চ শৈল; কোথাও নদী প্রবাহিত, কোথাও জল পাওয়া দুষ্কর। আটিকা প্রদেশে উত্তম উত্তম বন্দর, পরিষ্কার বায়ু, কিন্তু শস্যের অভাব। বিওসিয়া প্রদেশে যথেষ্ট উর্ব্বরা ভূমি, যথেষ্ট শস্য; কিন্তু মৃত্তিকা সলিলসিক্ত ও বায়ু কুজ্‌ঝটিকা-

বিশিষ্ট। আরও পশ্চিমে চল। দেখিবে দেশ শৈলময়, অধিবাসীরা ছাগ মেষ চরায় ও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করে। দক্ষিণের উপদ্বীপেও বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। এইপ্রকার প্রদেশ-ভেদে অবস্থাভেদ ঘটায়, গ্রীসে অল্পস্থানে অধিক মনুষ্যচরিত্রের ভেদ ঘটিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম, ভাষা, ও রীতিনীতির বহু-পরিমাণ একতা সত্ত্বেও গ্রীকচরিত্রে যে বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, এইরূপ দৈশিক বৈচিত্র্যই বোধ হয় তাহার একটী প্রধান কারণ।

পর্ব্বত দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত বলিয়া গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ইতিহাসলেখকেরা ইহার কয়েকটী ফল বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, গ্রীস কখনই এক সাম্রাজ্য হইতে পারিল না, এবং এ নিমিত্ত অগ্রে মাসিডনের ও পরে রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক রাজ্য ক্ষুদ্র হওয়ায় অল্প দিনেই রাজারা সমুদায় প্রজামণ্ডলীর পরিচিত হইয়া পড়েন, এবং ইহাতে রাজাদিগের দেবত্বে বা অসাধারণ শক্তিতে লোকের বিশ্বাস তিরোহিত হয়। স্নতরাং ক্রমে সর্ব্বত্র রাজপদ উঠিয়া যায়, এবং প্রদেশের অবস্থাভেদে সম্ভ্রান্ততন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ, দেশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, স্থানভেদে ভাষাভেদ সংঘটিত হইয়াছিল। এই রূপে আথেন্সে এক প্রকার ভাষা, স্পার্টায় আর এক প্রকার, থিব্‌সে অপর আর এক প্রকার। আবার যে প্রদেশের ভাষায় যে বিষয় প্রথমে আলো-চিত হইয়াছিল, ভিন্ন স্থানের লোকে লিখিলেও, সেই প্রদেশের ভাষায় সেই বিষয়ের আলোচনা করাই রীতি ছিল। এই রূপে মহা-কাব্য সকল, দুর্ব্বোধ্য হইলেও, হোমরের ভাষায় রচিত হইত। আথেন্সে যে সকল নাটক লিখিত বা অভিনীত হইত, তাহাদিগের অন্তর্গত গীতগুলি আথেন্সের পরমশত্রু স্পার্টার ভাষায় গ্রথিত হইত। এমন কি যখন স্পার্টাবাসীরা আটিকা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে-ছিল, তখনও এ রীতির ব্যত্যয় ঘটে নাই। আমাদিগের দেশের কবিরা যখন কৃষ্ণবিষয়ক গীতরচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণ করেন, তখন তাঁহারা গ্রীকদিগের পথাবলম্বী হন।

যে সকল পর্ব্বত পূর্ব্বপশ্চিমে প্রধাবিত, তাহারা যেরূপ অবস্থাভেদ উৎপন্ন করে, উত্তরদক্ষিণে ধাবিত পর্ব্বতগুলি সেরূপ করে না। হিমা-চল তিব্বত হইতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিতেছে। হিন্দুকুশ আফগান-

স্থান হইতে তুর্কিস্থান পৃথক্ করিতেছে। আল্পস্ পর্ব্বত ইতালীকে ইউরোপের অপরভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিতেছে। পীরেনিস্ ফ্রান্স ও স্পেন দেশ বিভিন্ন রাখিতেছে। ইউরাল পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে রুশিয়া। আপিনাইন্ পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বেই একই ইতালী রাজ্য। রকি ও আণ্ডিস্ পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেশভেদের হেতু হয় নাই। এইরূপ হইবার একটী কারণ বোধ হয় এই, যে পূর্ব্ব-পশ্চিম-প্রধাবিত পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা যে প্রকার উভয়পার্শ্ববর্ত্তী দেশের শীতাতপভেদ ঘটে, উত্তর-দক্ষিণ-প্রধাবিত পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা সে প্রকার হয় না। যখন সমতল প্রদেশস্থ অধিবাসীরা বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠে, তখন অপেক্ষাকৃত শীতল পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীদিগের নিম্নদেশ আক্রমণ দ্বারা জয়লাভ করিবার কথা কোন কোন স্থানে শুনা যায়। কিন্তু আবার যখন কোন দেশে বিজেতৃদল প্রবেশ করে, তখন পরাজিত ব্যক্তিবর্গ পর্ব্বতপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর্য্যদিগের আক্রমণে এ দেশে সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতির এইরূপ দশা হইয়াছে।

জঙ্গলে সভ্যতাবিস্তারের প্রতিবন্ধকতা করে। অরণ্য কাটিয়া কৃষি-কার্য্যের অধিকারবৃদ্ধি, সভ্যতাবিস্তৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। ইউ-রোপখণ্ডে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে বন ছিল। কিন্তু বহুকাল হইল নৈসর্গিক কারণে বা মনুষ্যের প্রভাবে দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশের কানন সকল বিনষ্ট হয়; এবং সেই প্রদেশেই অগ্রে সভ্যতার উদয় হয়। গ্রীস, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, ও ইংলণ্ড, ইহার দৃষ্টান্তস্থল। জঙ্গলের অধি-বাসীরা প্রায়ই অসভ্য, এই কারণে জঙ্গলিয়া বলিতে অসভ্য বুঝায়। যখন কোন দেশ বিজিত ও উপনিবেশিত হয়, তখন পরাভূত জাতি অনেক স্থলে নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। এই নিমিত্ত কাননপ্রদেশ অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির বাসস্থল হয়। আমেরিকা ও সাইবিরিয়ায় দেখা যায় যে, যাহারা জঙ্গলে বসতি করে, তাহাদিগের প্রকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে জঙ্গলিয়া হইয়া যায়। কোন কোন বুদ্ধিমান্ লোকে বিবেচনা করেন যে, মর্ম্মণদিগের বহুবিবাহ আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের নিকট হইতে অনুকৃত।

যাহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জঙ্গলে বাস করে, তাহারা দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রকায়, কদাকার, ও নির্ব্বোধ হয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ শালবনের

মেচিরা, সিংহলের বৃহদরণ্যের বেদাগণ, মাডাগাস্কার দ্বীপের জোলা-হিরা, ফ্লোরিডা উপদ্বীপের নিবিড় কাননের আমেরিকেরা ইহার প্রমাণ। যে স্থানে বহুদূরব্যাপী কানন থাকে, সে স্থানের ভূমি এত সলিলসিক্ত হয়, যে তাহা মনুষ্যের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়। ইহাই বোধ হয় জঙ্গলবাসীদিগের অবনতির কারণ।

বাহ্য জগতের অবস্থাভেদে মানবেতিহাসে কিরূপ ফলভেদ ঘটিয়াছে, আমরা দেখাইলাম। কিন্তু কেহই যেন মনে করেন না যে, কেবল দৈশিক সংস্থান দ্বারা, কেবল চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহিঃপদার্থ দ্বারা ইতিহাসের ঘটনামালার ব্যাখ্যা করা যায়। প্রত্যেক জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিও এ স্থলে গণনীয়। নীলনদের তীরে কাফ্রিরা থাকিলে যে তাহারা প্রাচীন মিসরবাসীদিগের ন্যায় সভ্য হইতে পারিত, কে সাহস করিয়া বলিবে? আর্য্যেরা যদি ভারতবর্ষে না আসিতেন, তাহা হইলে কি এদেশে বাল্মীকি বা কালিদাসের ন্যায় কবি, গৌতম বা কপিলের ন্যায় দার্শনিক, এবং আর্য্যভট্ট বা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় গণিতবেত্তা জন্মিত? যদি বাহ্যবস্তু হইতেই সমুদয় হয়, তাহা হইলে মিসর, ব্যাবিলনিয়া ও গ্রীসের সভ্যতা অন্তর্হিত হইল কেন? দেশের ভাব প্রায় একরূপই আছে, কিন্তু অধিবাসীদিগের ভাব অন্য প্রকার হইয়াছে কেন? আর্য্যজাতি ইউরোপখণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে তথায় অন্যজাতীয় লোকে বাস করিত; কিন্তু তাহাদিগের সভ্যতার চিহ্ন ভগ্নপ্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র। য়ীহুদিরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে চিনা যায়। গ্রীন্‌লণ্ডে যাও, আফ্রিকায় যাও, অষ্ট্রেলিয়ায় যাও, ইংরেজ সর্ব্বত্রই সমান দেখিবে। চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের অট্টালিকায় যে কাফ্রি চিত্রিত আছে, এখনও তাহার মূর্ত্তি বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আবার দেখ, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যে আর্য্যজাতি যে প্রকার উন্নতি দেখাইয়াছেন, অন্য কোন জাতি সেরূপ পারে নাই; এবং সৈমজাতি হইতেই য়ীহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলমান তিনটী একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্ষমতা; এবং যে কোন অবস্থায় যে জাতিকে রাখ না কেন, সহসা তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না।

কিরূপে নিগ্রো, মোগল, মালয়, আর্য্য, সৈম, প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকৃতি-বিশিষ্ট জাতির উৎপত্তি হইল, স্থির করিয়া বলা যায় না। পরিণাম-

বাদী উয়ালেস্ সাহেব বিবেচনা করেন যে, আদৌ বাহ্যাবস্থার ভেদই এরূপ জাতিভেদ উৎপন্ন হইবার কারণ। যখন মনুষ্যেরা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, যখন তাহাদিগের কোনরূপ পরিধেয় ছিল না, যখন তাহারা অগ্নিকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা পাক করিতে বা নিয়মিত শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে জানিত না, তখন তাহারা যে দেশে যাইত, অন্য জীবের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সে দেশের স্বভাবানুবর্ত্তী হইত। সে দেশে শীত থাকিলে, সম্পূর্ণরূপে শীত সহ্য করিত; সে দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলে, আতপতাপে পুড়িত। সেখানে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিলিত, তাহাই আহার করিত। এই রূপে তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাসস্থলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইত।

কিন্তু প্রাচীন কালে যাহা হইয়া থাকুক, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্য জগতের ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে এবং মনুষ্যের প্রভাব বাড়িতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানকালে দেশের অবস্থা অপেক্ষা অধিবাসীদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির উপর সভ্যতাবৃদ্ধির নির্ভর করিতেছে। যে জাতি যে পরিমাণে নৈসর্গিক নিয়ম অবগত হইতেছে ও তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, সেই জাতি সেই পরিমাণে উন্নত হইতেছে। কালে বোধ হয় মনুষ্যের প্রভুত্ব এত বহুবিস্তীর্ণ হইবে, যে ভূমণ্ডলে মানবের অপ্রয়োজনীয় জীবোদ্ভিদ্ কিছুই থাকিবে না, এবং প্রাকৃতিক শক্তিপরম্পরা এত দূর মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইবে, যে তাহা কবিরাও কখন কল্পনা করিতে সাহস করেন নাই।

[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মনুষ্যে ভক্তি।

গুরু। (যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র।) ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, ((১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না। (২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।)

দেখা যাউক, (মনুষ্যমধ্যে) কে ভক্তির পাত্র। (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র।) তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইতে হইবে না। (গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ; আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই অসম্ভব,) ইহা শারীরিক বৃত্তি আলোচনা কালে বুঝাইয়াছি।* এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র। (হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, এজন্য হিন্দুধর্ম্মের গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি। পুরোহিত, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্ব্বথা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা ও পবিত্রস্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র।) যিনি কেবল চাল কলার জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র। (হিন্দুধর্ম্মে ইহাও বলে, যে স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বলে যে স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে।) (গৃহধর্ম্মে ইহাঁরা ভক্তির পাত্র; যাঁহারা ইহাঁদের স্থানীয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহমধ্যে যাহারা নিম্নস্থ, তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা মাতাকে পুত্র কন্যা বা শ্বশুর শাশুড়ীকে বধূ ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই—সে গৃহ নরকবিশেষ।) এ কথা কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রায়

---

* শিষ্য। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পরসাপেক্ষ, তবে কোন্ গুলির অনুশীলন আগে আরম্ভ করিব?

গুরু। সকলগুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে।

শিষ্য। আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না, যে কি প্রকারে কোন্ বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব?

গুরু। এইজন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক। শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। কেবল শৈশবে কেন চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এইজন্য হিন্দুধর্ম্মে গুরুর এত মান। আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা যখন বলিব, তখন এ কথা মনে থাকে যেন।

স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্রেক অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম্মেরও সেই উদ্দেশ্য।

(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্ত্তার ন্যায়, (পিতা-মাতার ন্যায়, রাজা) সেই (সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র।) প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্—নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। উৎসবাদির দ্বারা এবং এইরূপ অন্যান্য সদুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্ম্মে পুনঃপুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল।

শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে ইহা বুঝিতে পারি, আক্‌বর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ বা পঞ্চদশ লুইর মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে?

গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে দেশে এক জন রাজা নাই—যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে, যে রাজভক্তি কোন মনুষ্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। আমেরিকার কংগ্রেসের বা ব্রিটিশ্ পার্লিমেন্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস্ ও পার্লিমেন্ট্ ভক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চার্ল্‌স্ ষ্টুয়ার্ট্ বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু তত্তৎ সময়ের ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজা তত্তৎ প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র। আর একটা কথা বলিয়া রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্ম্মতঃ সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র। তার পর তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য।

(৩) (যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভক্তির পাত্র।) গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ, কেবল গার্হস্থ্য গুরু নহেন, সামাজিক গুরু। (যাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য।) পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইহাঁদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইহাঁরা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইহাঁরা রাজাদিগেরও গুরু। রাজগণ ইহাঁদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন। এই হিসাবে, ভারতবর্ষ ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্টি—এই জন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম—সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও গেলিলীও, নিউটন, কান্ত্, কোম্‌ৎ, দান্তে, সেক্ষপিয়র প্রভৃতি সেই স্থানে।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে, যে যাঁহার দ্বারা আমি যে পরিমাণে উপকৃত, তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত হইব?

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোক-শিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণস্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোন রূপ শাসিত হইবে না। তাহার মর্ম্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাঁদের প্রতি সমুচিত ভক্তির অনুশীলন পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। কৈ, এ ধর্ম্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ম্মে শিখায় না?

গুরু। এটা অতি মূর্খের মত কথা। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির

পাত্র, তাহার কারণ এই, যে ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞান-বেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্য-প্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই হিন্দুধর্ম্মের উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই, সহজে উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। আধুনিক মত এই, যে ভণ্ড ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই দুর্জ্জয় ব্রাহ্মণভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে।

গুরু। দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটী উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্য-শ্রেণী ভূমণ্ডলে দুর্লভ। তাঁহারা বাহাদুরির জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যে ঐশ্বর্য্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে। একমন, একধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই, সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কাম-ধর্ম্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনা-দিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যে সমাজ-শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্য ব্রাহ্মণভক্তি প্রচার করিয়া-ছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে নীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজনের মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল

দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়।

শিষ্য। তা যাক্। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। (যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব;) যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে (যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।) ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম। মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য এইরূপ আছে;—"পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পুনশ্চ বনপর্ব্বে অজগর পর্ব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন,—"বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—"অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" এরূপ কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ, বৃদ্ধগৌতমসংহিতায় ২১ অধ্যায়ে—

> "ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
> তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥
> অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
> উপবাসরতান্ দান্তাং স্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥
> ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
> চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়-নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ* হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

শিষ্য। যাক্। এক্ষণে বুঝিতেছি মনুষ্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজশিক্ষক। আর কেহ?

গুরু। (৪) যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্ম্মিক, নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র। ইহা বুঝাইয়াছি।

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র বা অবস্থাবিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞা-কারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে। যে, কোন কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরাজিতে ইহার একটি বেশ নাম আছে,—Subordination. এই নামে আগে Official Subordination মনে পড়ে। এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই—কিন্তু যাহা আছে, তাহা বড় ভাল জিনিস নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় একটা সর্ব্বনিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে। ভয়ের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাঁহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ অকারণে ভয় করিবে না। কিন্তু Official Subordination ভিন্ন অন্য এক জাতীয় আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয়। সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধর্ম্ম কর্ম্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়—এক জনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে ঐক্য চাই। ঐক্য জন্য ইহাই প্রয়োজনীয়, যে একজন নায়ক হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে। এখানেও Subordination

* "গুরুপূজা ঘৃণা (দয়া) শৌচং সত্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
প্রবর্ত্তনং হিতানাঞ্চ তৎসর্ব্বং বৃত্তমুচ্যতে॥"

প্রয়োজনীয়। কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্ম্ম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। যে কাজ দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে; কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয়, যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য, যে নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন—নহিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প।

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে।

(৭)(সমাজকে ভক্তি করিবে।) ইহা স্মরণ রাখিবে, (যে মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই শিক্ষক।)

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন, যে মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সর্ব্বত্র সর্ব্বথাই সমান—কেহ কাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন "my dear father"—অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতিমাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চাল্‌কলালোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীরূপা মনে করিতে পারি না—কেন না, লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন; রাজপুরুষ অত্যাচারকারী রাক্ষস, মনে করেন। সমাজ-শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্রূপের স্থান। ধার্ম্মিক

বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধার্ম্মিককে "গো বেচারা" বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব না; কাজেই ঐক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড়-সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য। উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন, তাহা আমি কখন মনে করি নাই।

গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুষ্যভক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভালবাসার অত্যাচার।

লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু, অথবা স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্য-শূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর একশ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে সেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই, অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার কথা শুনিতে হইবে, আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে। তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হইক, আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্

কার্য্য মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কার্য্যকর্ত্তা, এবং তাহার ফলভোগী, তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, যে তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য্য করেন; এবং তাঁহার মতের বিপরীত কার্য্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী এই জন্য, যে তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্তা স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কেবল তাঁহারই সদসৎ বিবেচনা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তিদমনের অধিকার দিয়াছি; যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্য্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাঁহারও অধিকার নাই; যে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, তৎপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার অধিকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন। যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্যমাত্রেই অধিকারী; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কার্য্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়া আপন আপন প্রবৃত্তি মত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা; পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা। যে এই স্বানুবর্ত্তিতার বিঘ্ন করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী। রাজা ও সমাজ, ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব্ব পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট্ মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা, অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সর্ব্বতত্ত্বদর্শী এবং অনন্তজ্ঞান-বিশিষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে নাই। কৈকেয়ীর অত্যা-

চারে দশরথকৃত রামের নির্ব্বাসনে, দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাসনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিগণ নীতিবেত্তা নহেন; নীতি-বেত্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সুহৃদ্, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে, তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, অমুক বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, সেই কালকূটরূপিণী ধনিকন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্র্যপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না; সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের উপার্জ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটী নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দুসমাজে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ভার্য্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ, নববঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ এটুকু বলা কর্ত্তব্য, যে কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেকগুলিই বাহুবলের অত্যাচার।

যাহা হউক, মনুষ্যজীবন, ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচারপীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্য-জাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ সেই পরপীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায়, ধর্ম্মের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায়, সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অব-

স্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্ব্বিধ পীড়নের মধ্যে প্রণয়ের পীড়ন কাহারও অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে, যে রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্ নহেন, বা কেহ তেমন সদা সর্ব্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না—সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা, প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে; কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই—কেন না ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজী পাঁটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ঔচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না—কেন না, জানেন, যে ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজী পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন।

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজনে। জড়পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য, সমাজের প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের সুনির্ব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রয়োজন। এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুষ্যের ত্যাজ্য বা আদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না। অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া, মনুষ্য, ধর্ম্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্ম্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মেরও অত্যাচার আছে বটে, এবং ধর্ম্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্তা হয়,

তাহারও অত্যাচার ঘটিবে, কেন না অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্ম্মের অত্যাচারশমতাক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয় জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচারশাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে, যে প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহাই ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ, যে স্বার্থপরতাশূন্য স্নেহ দুর্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না—সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না, কেন না পুত্র অর্থোপার্জ্জন করিলে কোন্ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন?—অতএব ঐরূপ দর্শনমাত্র আকাঙ্ক্ষী স্নেহকে অনেকেই অস্বার্থপর স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে—এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাঁহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাঁহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; যে ধনের কামনা করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, পুত্রমুখদর্শনসুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল, সেও আত্মসুখ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যদি সুখ থাকে, থাক;—সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল—নিত্য পুত্রমুখদর্শন; তাহার অভিলাষিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্যদুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল; এখানে, মাতা স্বার্থপর, কেন না আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল।

মনুষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তসুখকর, কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য সুখের অপেক্ষা প্রণয়সুখের অভিলাষী, এইজন্য লোকে এইরূপ স্নেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহযুক্তের ; স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষী বলিয়া, সাধারণ মনুষ্যস্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতেই হইবে।

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য, স্নেহ মনুষ্যহৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা এইটী পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্যের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্যস্নেহ অদ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও বৎস-স্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয়, এবং বাৎসল্য দাম্পত্য ব্যতীত, পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটী মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে।

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, পুত্রমুখদর্শনকামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্নেহবতী। যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী।

যত দিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, ততদিন মানুষের ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের যথার্থ স্ফূর্ত্তি ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না—তাঁহারা অত্যাচারীও নহেন। অন্যত্র, ধর্ম্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম্ম এক। দুইটিমাত্র মূলসূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে,—এবং আত্মচিত্তের স্ফূর্ত্তি এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি, পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। "পরের অনিষ্ট করিও না; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও।" এই মহতী উক্তি জগতীয় ভাবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রের একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক

উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্ত্বের সহিত, এই মহানীতিতত্ত্বের ঐক্য আছে। এবং পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ।

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূলসূত্রাবলম্বন করিলেই, ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন, তাঁহার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করা উচিত, যে আমি কেবল আপন সুখের জন্য, হস্তক্ষেপ করিব না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব; তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না।

অস্বার্থপর প্রেম এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্বসংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম্ম যত দিন না সার্ব্বজনীন প্রেম স্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

একা।*

"কে গায় ঐ?"

বহুকালবিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক, পথ দিয়া আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর :—মধুর কণ্ঠে, এই মধু মাসে আপনার মনের সুখে মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে

* এই প্রবন্ধ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামক কোন কল্পিত ব্যক্তির উক্তি।

যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণশরীরা নীলসলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছে; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময় অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গতাড়িত জলবুদ্বুদ সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু, এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত এই সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই; যৌবনে, যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্যচরিত্র এখনও তাই আছে; কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে, সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে

বসিলাম ; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম ; যে কথা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল কথা বলিতে লাগিলাম ; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে, পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ, আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ-কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্ত-পবন-বিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিতেছি, এই সংসার-চক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার, আবার সেই খানে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিতেছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিতেছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কন্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে ; মনুষ্য-

হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনিসংমিলিত, বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারগীতি আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

———

পদ্য ।

Ramakanta
Bhatta

Ramaschandra Bhatta
Post: Nainchhara
Vill: Rauleghim
Dist. Sylhet

Balen

Akay Bondhu Roy

Post Yagapur
Vill I... pur

Sylhet

প্রকৃতি।

আদিদেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ সনাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি
আপনারে অসহ্য সমান॥
নাহি কেহ সহচর দেবতা-অসুর-নর
সিদ্ধ-গণ-চারণ-কিন্নর।
নাহি তথা দিবানিশি না উদয়ে রবি শশী
অন্ধকার আছে নিরন্তর॥
কোটি ভানু পরকাশ পরিধান পীত বাস
অন্ধকারে ভাবে ভগবান।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী হার দূর করে অন্ধকার
পূরট মুকুট মণিদাম॥
কণ্ঠে কৌস্তুভ আভা নানা অলঙ্কার শোভা
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড।
নবীন জলদ কাঁতি ইন্দু জিনি নখপাঁতি
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড॥
অচিন্ত্য অনন্তশক্তি হৃদয়ে ভাবেন যুক্তি
জল স্থল নাহি অধিষ্ঠান।
কথার সঙ্গতি নাই চিন্তিলেন গোঁসাই
আপনারে অসহ্য সমান॥
চিন্তিতে এমন কাজ এক চিত্তে দেবরাজ
তনু হইতে হইল প্রকৃতি।
চণ্ডীর চরণ সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
প্রকাশে ব্রাহ্মণ নরপতি॥

আদি দেবের শক্তি ভুবনমোহন মূর্ত্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী।
করিয়া সম্পুট পাণি মৃদু-মন্দ-ভাষিণী
সম্মুখে রহিলা নারায়ণী॥
রাজহংসবর জিনি, চরণে নূপুর-ধ্বনি
দশ নখে দশ চন্দ ভাসে।
কোকনদ-দর্প-হর বেষ্টিত যাবক কর
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥
হেম-হার-বর ছলে কিবা সে তাহার গলে
স্থির হয়্যা সৌদামিনী বৈসে।
নিরুপম পরকাশ মন্দ মধুর হাস
ভঙ্গীনব শিখিবার আশে॥
বন্ধুক কুসুম ছটা ললাটে সিন্দূর ফোঁটা
প্রভাতকালের যেন রবি।
অধর প্রবালজ্যোতি দশন মাণিকপাঁতি
ছুঁহেতে বদল করে ছবি॥
কপালে সিন্দুর-বিন্দু নব অরবিন্দ-বন্ধু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তল ছলা
বন্দী করিল রবি ইন্দু॥
তিল ফুল জিনি নাসা বনপ্রিয় জিনি ভাষা
ভুরুযুগ চাপ সহোদর।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী
শিরোরুহ অসিত চামর॥
অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ ভুবনমোহন রঙ্গ
মণিময় মুকুট মণ্ডন।
হাসিতে বিজুলি খেলে কপালে কুন্তল দোলে
হেম মুকুলিকা সুশোভন॥
প্রভুর ইঙ্গিত পায়্যা আদিদেবী মহামায়া
সৃষ্টি সৃজিতে কৈলা মন।
উমা-পদে হিত চিত রচিল নূতন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

[মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজূট সঙ্ঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটি কট্ট সদ্যঃ মরা হস্তি-ছালা॥
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥
খিয়া তা খিয়া তা খিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্তকেশে॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

ভারতচন্দ্র।

দক্ষযজ্ঞ নাশ।

ভূতনাথ ভূত সাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে॥
(সৈন্যস্থূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি॥
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
যাও যাও হুঁ দিখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়া॥
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নির্বৃতি।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি॥)
রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গিসঙ্গিয়া।
ঘোর বেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিঁড়িল।
পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥
বিপ্র সর্ব্ব দেখি খর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ লাথি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥
যজ্ঞ-গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
উর্দ্ধহাত বিশ্বনাথ-নাম-গীত গায়িছে॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ্ হাপ্ দুপ্ দাপ্ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥
উর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পিঃ ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে॥

রাজ্যখণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
স্থূল থূল কূল কূল ব্রহ্মাডিম্ব ফুটিছে॥
মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টিঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে॥
[ভারতচন্দ্র।

মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি।

দশ দিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুণ হয়ে বহে ঊনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকী।
হুড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুট ঘুট আঁধার শিলার তড়তড়ী॥
ঝড়ে উড়ে কানাৎ দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোঁড়া, ডুবে মরে হাতি।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তরবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমাত্তা উরুদু বাজার॥
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাভাসে॥

কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোঁসাই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াৎ ভাসিল বীণার লাউ ধরি॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কাঁদে লোক প্রাণ যায় যায়॥
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইলা সৃষ্টি॥
গাড়ি করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায়॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায়।
ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায়॥

[ভারতচন্দ্র।

মানসিংহের যশের যাত্রা।

চলে রাজা মানসিংহ যশোর* নগরে।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে॥
ঘোড়া উট হাতি পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়িতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান্॥
হাতির আমারী ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥
আগে চলে লালপোশ খাশবরদার।
সিফাই সকল চলে কাতার কাতার॥

---

* যশোর জেলার সিবিল ষ্টেশন যে যশোর, এ সে যশোর নহে। ঈশ্বরীপুর যশোরের কথা হইতেছে; সে সুন্দরবন মধ্যে।

তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুদু বাজার॥
আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া॥
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার॥
প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

[ভারতচন্দ্র।

মানসিংহ ও প্রতাপ-আদিত্যের যুদ্ধ।

ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্ দামামা দম্ দম্
ঝনন্ন ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে॥
কত নিশান ফর্ ফর্ নিনাদ ধর্‌ধর্
কামান গর্ গর্ গাজে।

(সব জুবান রজপুত পাঠান মজবুত
কামান্‌শরযুত সাজে॥
ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ
সিফাইগণ রণমাঝে।
পরি করাইবখতর পোশাক বহুতর
শোভিত শিরপর তাজে॥
বসি অমারী ঘর পর আমীর বহুতর
ছলায় গজবর রাজে।
পুর যশোর চমকত নকীব শত শত
হুসার ফুকরত কাজে॥
হয় গজের গরজন সেনার তরজন
পয়োধি ভরছুন লাজে।
দ্বিজ ভারত কবিবর বনায় তঁহিপর
প্রতাপ দিনকর সাজে॥) ধ্রু

যুঝে প্রতাপ-আদিত্য
যুঝে প্রতাপ-আদিত্য।
ভাবিয়া অসার
ডাকে মার মার
সংসার সব অনিত্য॥

শিলাময়ী নামে ছিলা তার ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥
বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহ রাজে।
লস্কর লইয়া সত্বর হইয়া
প্রতাপ-আদিত্য সাজে॥
ধু ধু ধম্‌ ধম্‌ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্‌ ঝম্‌
দমামা দম্‌ দম্‌ বাজে।
হুড়্‌ হুড়্‌ হুড়্‌ দুড়্‌ দুড়্‌ দুড়্‌
কামানের গোলা গাজে॥

সিন্দূর সুন্দর মণ্ডিত মুদ্গার
ষোড়শ হলকা হাতি।
পতাকা নিশান রবিচন্দ্রবান্
অযুতেক ঘোড়া সাতি॥
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর
বায়ান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া
দুই দলে গালাগালি॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে
মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে॥
হান্ হান্ হাঁকে খেলে উড়াপাকে
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধূমে তম রণভূমে
আত্ম পর নাহি শুঝে॥
তীর শন্‌শনি গুলি ঠন্‌ঠনি
খাঁড়া ঝন্ ঝন্ ঝাঁকে।
মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল লোফে
ক্রোধে হান্ হান্ হাঁকে॥
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥
পাতসাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ-আদিত্য হারে॥
শেষে ছিল যারা পালাইল তারা
মানসিংহ জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপ-আদিত্যে লৈল॥

দল বল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে
চলে মানসিংহ রায়।
ললিত স্বচ্ছন্দে পরম আনন্দে
রায় গুণাকর গায়॥

[ভারতচন্দ্র।

ঝড়।

(২ রা জৈষ্ঠ, ১২৫৯ সাল।*)

জগতের আয়ু তুমি, বায়ু নাম ধর।
বায়ু রোধ করি শেষ আয়ু-বায়ু হর॥
ভূতের প্রধান তুমি, ভূতরাজ নাম।
জল স্থল অনল আকাশ তব ধাম॥
জলের জীবন নাম, নাম মাত্র সার।
তুমি কর জীবনের জীবন সঞ্চার॥
আগুনে কি গুণ আছে, দীপ্তি কোথা তার?
তুমি তার সখা বোলে করে অহঙ্কার॥
প্রতিভা প্রকাশ তার তোমায় পাইলে।
অনল সলিল হোতো তুমি না থাকিলে॥
ক্ষিতি এ যে খ্যাতি কিছু সুযশ-সৌরভ।
সে কেবল আপনার গুণের গৌরব॥
ধরা ধরে হৃদয়েতে বস্তু যত যত।
তোমার করুণা বিনা সব হয় হত॥
স্থাবর জঙ্গম জীব জন্তু সমুদয়।
তোমার চালন বিনা পালন কি হয়?
একবার ধর যদি বিপরীত রীতি।
কোথা থাকে ক্ষিতি, তার কোথা থাকে স্থিতি?
আকাশের শোভা শুধু তোমার কারণ।
যতনে তোমারে তাই কোরেছে ধারণ॥

---

* ইহার পূর্ব্বদিন একটা বড় Cyclone হইয়াছিল।

স্থলে জলে ঘটে ঘটে থাকিয়া আকাশ।
তোমারে হৃদয়ে ধরি বাড়ায় উল্লাস॥
মৃত্তিকার গন্ধ গুণ, তোমার কৃপায়।
ভাল মন্দ গন্ধ সব নাসাপথে ধায়॥
পদার্থের দোষ গুণ ঘ্রাণেতে জানিয়া।
উত্তম গ্রহণ করি, অধম ছাড়িয়া॥
আপন স্বরূপ তুমি, আপন স্বরূপ।
বায়ুর বিচিত্র গতি অতি অপরূপ॥
নিরাকারে চলিতেছে ভয়ঙ্কর চেলে।
না জানি কি হোতো আর হস্ত পদ পেলে॥
এই চলি, এই বলি, চলা বলা যত।
কল বল সকল তোমার হস্তগত॥
তুমি না চলালে, নাই চলিবার কল।
তুমি না বলালে, নাই বলিবার বল॥
কলেরে বিকল করি দেহ কর মাটি।
সকল কলের কল, তুমি "কলকাটী"॥
এ কলে এ কলকাটী যে জন চালায়।
সাধু সাধু সাধু রে প্রণাম তাঁর পায়॥
প্রণিপাত তোমারে হে প্রতাপী পবন।
ভব মাঝে তব সম আছে কোন্ জন?
কখন কি ভাবে থাক বুঝে উঠা ভার।
ত্রিভুবন জয় করে বিক্রম তোমার॥
বানরের পিতে তুমি, অনলের মিতে।
ক্ষণমাত্রে পার সব রসাতলে দিতে॥
উগ্রভাবে এক বার হইলে উদয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ঠেকাঠেকি হয়॥
ত্রিভুবন রেখে দেও এক ঠাঁই কোরে।
রবি শশী পড়ে খসি, তারা যায় ঝোরে॥
আকাশের চাল ভেঙ্গে পাতালেতে চালো।
পাতালের জল তুলে আকাশেতে ঢালো॥
ইন্দ্রধাম উপুড়িয়া ফেলো নাগপুরে।
নাগপুর ইন্দ্রধামে, শূন্যে উঠে ঘুরে॥

নীচু গিয়ে উচু উঠে, উচু পড়ে নীচে।
মাঝে থেকে মাঝখান, মরে আগে পিছে॥
স্থিরমূর্ত্তি ধরি তুমি থাক যে সময়।
সে সময়ে স্থিরভাবে থাকে সমুদয়॥
চরাচরে স্বভাব স্বভাব ভাল ধরে।
পেয়ে শিব যত জীব গুণগান করে॥
মনে কর কি কোরেছ গত শুক্রবারে।
হুলস্থূল বাধায়েছ অখিল সংসারে॥
একে সবে বায়ুবলে হারায়েছ দিশে।
তাহে বায়ু বায়ুগ্রস্ত, রক্ষা আর কিসে?
কাণ পেতে সমীরণ, শুন শুন সব।
চারিদিকে হইতেছে কত কলরব॥
বাগানেতে দেখিয়াছি গাছে গাছে নিচু।
এখন সে নিচু মাঠ, নাহি আর কিছু॥
পুত্র তব লঙ্কাপুরে বিস্তারিয়া গ্রাস।
রাবণের মধুবন কোরেছিল নাশ॥
তুমি তার বাপ বটে, ধর বহু বল।
কটাক্ষে করিলে শেষ সব মধুফল॥
তোমারে সাবাসি আছে, গুণে নাই ঘাটি।
এত খেয়ে গলদেশে বাধে নাই আঁটি॥
খেলে খেলে আঁব খেলে, ক্ষুধা ছিল যেন।
ছোট বড় গাছ সব পেটে দিলে কেন?
বংশ সহ বংশ নাশ করিয়াছ তুমি।
বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া কোরেছ সমভূমি॥
উদরে পুরেছ কত সাঁই সাঁই হাঁকে।
কাকের কোরেছ শেষ, বাকি আর কাকে?
মেষ খেলে, অজা খেলে, মজা দেখি এতো।
কেমনে খাইলে কাক, সে যে বড় তেতো॥
পেটের জ্বালায় খেলে হাতি ঘোড়া সাপ।
হারায়েছ হিঁদুয়ানি ছুঁলে হয় পাপ॥
জগতের প্রাণ হোয়ে প্রাণের বাতাস।
জগতের করিয়াছ কত সর্ব্বনাশ॥

সমভূমি করিয়াছ গোলাগঞ্জ গ্রাম।
গ্রাম নাই, ধাম নাই, আছে মাত্র নাম ॥
হাহাকার পড়িয়াছে প্রতি ঘরে ঘরে।
বাস্তু গেল, বৃক্ষ গেল, কোথা বাস করে?
অনাহারে সূর্য্য-করে প্রাণে মারা যায়।
দেশে আর তরু নাই, কোথায় দাঁড়ায়?
গৃহ আর বৃক্ষাঘাতে মোলো কত লোক।
পরিবার কাঁদে, পেয়ে ঘোরতর শোক ॥
কারো দারা, কারো পুত্র, কারো বন্ধু ভাই।
কারো কারো সংসারেতে কেহ আর নাই ॥
পতি-শোকে সতী কাঁদে, সতী-শোকে পতি।
সুত-শোকে প্রসূতির দারুণ দুর্গতি ॥
সমীরণ এ সকল তব অত্যাচার।
হাহারবে ভরিয়াছে অখিল সংসার ॥
যা খাবার খাইয়াছ, দোহাই দোহাই।
আর তুমি খেয়োনাকো খেয়োনাকো ভাই ॥

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

সীতা ও সরমা।

ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।

রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে!—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরি-দলে সিন্ধু-পারে; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে;" আশা, মায়াবিনী,—
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, প্রান্তরে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে!
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে,
তরুমূলে; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!

না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে !
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেন কালে তথা,
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে ; সরমা-সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে !
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে ;—"দুরন্ত চেড়ীরা
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ন যথা !
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে !"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে ; আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী ;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,

চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে?"
কহিলা সরমা;—"দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী,
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু, কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!

"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ! রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!
জাগা'ত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম,—স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনু ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল-রতন-সম) পরিতাম কেশে;
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়ন-মণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ

সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে।"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা) ! "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে ?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি * আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি !
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি

---

* বনের শোভা।

নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
(ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা !) এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী !

কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি !
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।”

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

চাতক-পক্ষীর প্রতি।

কে তুমি রে বল পাখি,
সোনার বরণ মাখি,
গগনে উধাও হয়ে
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,
এত সুখে সুধামাখা সঙ্গীত শুনাও।

বিহঙ্গ নহ ত তুমি ;
তুচ্ছ করি মর্ত্ত্যভূমি,
জ্বলন্ত অনল প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল-পথে সুস্বর ছড়াও।

অরুণ উদয় কালে
সন্ধ্যার কিরণ-জালে
দূর গগনেতে উঠি,
গাও সুখে ছুটি ছুটি,
সুখের তরঙ্গ যেন ভাসিয়া বেড়াও।

আকাশের তারা সহ
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,
কিন্তু শুনি উচ্চ স্বরে
শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে ;
আনন্দ-প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও।

একাকী তোমার স্বরে
জগত প্লাবিত করে,
শরতের পূর্ণ শশী
বিমল আকাশে বসি
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়।

কবি যথা লুকাইয়ে,
হৃদয়ে কিরণ ল'য়ে,
উন্মত্ত হইয়ে গায়,
পৃথিবী মাতিয়ে তায়
আশা মোহ মায়া ভয় অন্তরে জড়ায়।

যেমন খদ্যোত জ্বলে
বিরলে বিপিন-তলে,
কুসুম তৃণের মাঝে
আতোয়ী আলোক সাজে
ভিজিয়া শিশির-নীরে আঁধার নিশায়।

পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা
গোলাপ অদৃশ্য যথা
সৌরভ লুকায়ে রয়,
যখনি পবন বয়,
সুগন্ধ উথলি উঠি বায়ুরে খেপায়।

সেই রূপ তুমি, পাখি,
অদৃশ্য গগনে থাকি,
কর সুখে বরিষণ
সুধাস্বর অনুক্ষণ,
ভাসাইতে ভূমণ্ডল সুধার ধারায়।

চাতক-পক্ষীর প্রতি।

কেবা তুমি জানি নাই,
তুলনা কোথায় পাই ;
জলধনু চূর্ণ হ'য়ে
পড়ে যদি শূন্য বয়ে,
তাহাও অপূর্ব্ব হেন নাহিক দেখায়।

যত কিছু ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে—
নবীন মেঘের জল,
মুক্তামাখা তৃণদল—
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়।

পাখী কিম্বা হও পরী
বল রে প্রকাশ করি
কি সুখচিন্তায় তোর
আনন্দ হ'য়েছে ভোর ?
এমন আহ্লাদ আহা স্বরে দেখি নাই।

সুধা প্রণয়ের গীত
প্রাণ করে পুলকিত—
তারো সুললিত স্বর
নহে এত মনোহর,
এত সুধাময় কিছু না হেরি কোথাই।

বিবাহ-উৎসব-রব
বিজয়ীর জয়-স্তব,
তোর স্বর তুলনায়
অসার দেখি রে তায়—
মেটে না মনের সাধ, পূর্ণ নাহি হয়।

তোর এ আনন্দময়
সুখ-উৎস কোথা রয়,
বন কিম্বা মাঠ গিরি
গগন হিল্লোলে হেরি—
কারে ভালবেসে এত ভুল সমুদয়।

তুমিই থাক রে সুখে,
জান না ঔদাস্য দুখে,
বিরক্ত কাহারে বলে
জান না রে কোন কালে
প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কত।

আমরা এ মর্ত্ত্যবাসী
কভু কাঁদি কভু হাসি,
আগে পাছে দেখে যাই
যদি কিছু নাহি পাই,
অমনি হতাশ হ'য়ে ভাবি অবিরত।

যত হাসি প্রাণ ভরে
যাতনা থাকে ভিতরে,
এ দুঃখের ভূমণ্ডলে
শোকে পরিপূর্ণ হ'লে
মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর!

ঘৃণা ভয় অহঙ্কার
দূরে করি পরিহার,
পাখী রে তোমার মত
যদি না কাঁদিতে হ'ত—
না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর!

গগন-বিহারী পাখি
জগতে নাহি রে দেখি,
গীত বাদ্য মধুস্বর
হেন কিছু মনোহর
তুলনা হইতে পারে তোমার যাহায়!

যে আনন্দে আছ ভোরে
তাহার তিলেক মোরে
পাখি, তুমি কর দান,
তা হ'লে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতাতরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়।

[হেমচন্দ্র।

অশোকতরু।

কে তোমারে তরুবর, করে এত মনোহর,
রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য করে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে !
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরেথর,
বিরাজে শাখীর পর সদা হাস্যভরে—
সিন্দূরের ঝারা যেন বিটপী উপরে !
মরি কি বা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা,
আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অম্বরে।—
কে আনিল হেন তরু পৃথিবীভিতরে ?

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর,
অন্তরও তোমার কি হে ইহারি মতন ?
কিম্বা শুধু নেত্রশোভা মানব যেমন ?
আমি দুঃখী তরুবর, তাপিত মম অন্তর,
না জানি মনের সুখ, সন্তোষ কেমন ;
তরুবর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ?
অরে তরু খুলে বল, শুনে হই সুশীতল,
ধরণীতে সদানন্দ আছে এক জন,—
না হয় সন্তাপে যারে করিতে ক্রন্দন।

জানিতাম তরুবর, যদি হে তব অন্তর,
দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়—
মানবের মানচিত্রে কি আছে কোথায়।
কত মরু বালুস্তূপ, কত কাঁটা, শুষ্ক কূপ
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়—
সরসী, নির্ঝর, নদী, নাহি কিছু তায়।
তা হ'লে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজে বাসভূমি
নিত্য আসি কাঁদি বসি তোমার তলায় ;
ত্যজে নর, ধরি কেন তোমার গলায়।

তুমি তরু নিরন্তর আনন্দে অবনী'পর,
বিরাজ বন্ধুর মাঝে, স্বজন-সোহাগে;
তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগে।
ধরণী করান পান, সুরস সুধা-সমান
দিবানিশি বার মাল সম অনুরাগে,—
পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে।
স্রোতোধারা ধরি পায়, কুলু কুলু করি ধায়,
আপনি বরষা নীর ঢালে শিরোভাগে;
তরু রে বসন্ত তোর স্নেহ করে আগে।

কলকণ্ঠ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে,
শুনাতে আনন্দে বসে কুহু কুহু রব;
তরুবর, তোমার কি সুখের বিভব!
তলদেশে মখমল, তৃণ করে ঢল ঢল,
পতঙ্গ তাহাতে সুখে কেলি করে সব,
কতই সুখেতে তরু, শুন ঝিল্লীরব!
আসি সুখে পাঁতি পাঁতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি
খদ্যোত যখন তব সাজায় পল্লব—
কি আনন্দ তরু তোর হয় অনুভব!

তরু রে আমার মন তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারি-ধারা;
আমি, তরু, জগতের স্নেহ, সুখ হারা!
জায়া, বন্ধু, পরিবার সকলি আছে আমার
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা;—
মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসে না তাহারা!
এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের সুখ ভবের মন্দিরে।

এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এইরূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী-তীরে।
এক ভিক্ষা আছে আর, অন্য যদি কেহ আর,
আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
তরু, তারে দয়া করে তুষিও পরাণে!

[হেমচন্দ্র।

দেবনিদ্রা।

১

কোন মহামতি মানব-সন্তান,
বুঝিতে বিধির শাসন-বিধান,
অধীর হইল বাসনানলে ;—
"অবনী ত্যজিয়া অমর-আলয়ে
প্রবেশি দেখিবে দেবতানিচয়ে—
দেব পুরন্দর, রবি, হুতাশন,
বায়ু, হরি, হর, মরালবাহন,
দেখিবে ভাসিছে কারণ-জলে।

২

দেখিবে কারণ-সলিলে ভাসিয়া
চলে'ছে কিরূপে নাচিয়া নাচিয়া
পরমাণু-রেণু সময় বয়ে ;
দেখিবে কিরূপে আয়ুর সঞ্চার,
দেহের প্রকৃতি, কালের আকার,
জ্যোতিঃ, অন্ধকার, জগতস্বরূপ,
নিয়তি-শৃঙ্খল দেখিবে কিরূপ—
ভাবিতে লাগিল অধীর হয়ে।

৩

"আয় রে মানব" সহসা অমনি,
পূরি শূন্যদেশ হ'ল দৈবধ্বনি—
বাজিল দুন্দুভি, নাদিল অশনি,
খুলিল অমর-আলয়-দ্বার ;
ছুটিল আলোক ত্রিলোক পূরিয়া,
অপূর্ব্ব সৌরভ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
উচ্ছ্বাসে বহিল,—শ্রবণ ভরিল
মধুর অমর-সঙ্গীত ভার।

৪

মানব-নন্দন অমর-ভবনে,
প্রবেশি তখন পুলকিত মনে,
দেখিল নিরখি অমরালয় ;
গগন-মণ্ডলে অজস্র কেবলি,
মধুর নিনাদে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তার,
পরি-কন্যাগণ করিয়া ঝঙ্কার
সাধিছে বাদন মাধুরীময়।

৫

তপনমণ্ডল গগন-প্রাঙ্গণে,
কিরণ-সমুদ্র যেন বা শোভনে,
শিখার তরঙ্গ ছুটিছে তায়।
দেখিল আনন্দে সে কিরণ উঠি
অনন্ত অনন্ত যোজনেতে ছুটি
করিছে ভ্রমণ—পড়িছে ভাতিয়া
কিরণের রজ্জু যেন বা গাঁথিয়া,
সহস্র সহস্র গ্রহের গায়।

৬

আদিত্য ঘেরিয়া চলেছে ঘুরিয়া,
বিধুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া,
দেখিল তাহাতে সুধার হ্রদ ;

সে হ্রদ-সুধাতে পিপাসা মিটাতে,
প্রণয়-বিধুর হৃদয়-ব্যথাতে,
অসংখ্য গন্ধর্ব্ব, দানবমণ্ডলী,
কূলেতে বসিয়া অতি কুতূহলী
আনন্দে ভুঞ্জিছে মধুর মদ।

৭

সুখে নিদ্রা যায় দেবতা সকলে,
গিরি, উপবন, কানন, কমলে,
ত্রিদশমণ্ডলে সৌরভ বয় ;—
অমর নীরব, নাহি কলরব,
শূন্যেতে কেবলি মধুর সুরব
সঙ্গীত ঝরিছে, ত্রিদিব পূরিছে,—
"শান্তি—শান্তি—শান্তি" শবদ হয়।

৮

দেব-অট্টালিকা চন্দ্রাতপ-তলে,
দেব আখণ্ডল পারিজাত গলে,
অতুল মহিমা বদনে ভাতি ;
অপূর্ব্ব শয়নে সুখে নিদ্রা যায়,
পদতলে ইন্দ্র-মাতঙ্গ ঘুমায়,
চৌদিক ঘেরিয়া দামিনী খেলায়,
পুষ্কর প্রভৃতি মেঘেতে ভাতি।

৯

মহা তেজস্কর, প্রচণ্ড ভাস্কর
ঘুমায় অম্বরে, খুলিয়া সুন্দর
সহস্রকিরণ কিরীট-ভূষা !
অঙ্গ হ'তে ঝরে অপূর্ব্ব সুষমা,
জলধনু-তনু জিনিয়া উপমা,
নিকটে স্যন্দন, অরুণ, ঊষা।

১০

খুলে মৃগ-চিহ্ন অতুলিত শোভা,
অমল সুন্দর তনু মনোলোভা,
শশাঙ্ক ঘুমায় কিরণ-জালে।

সে তনু দেখিতে কিন্নর-কুমার,
কত শত দল, অপূর্ব্ব আকার,
রয়েছে দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে পূরিয়া—
সুধার সুগন্ধে আনন্দে মাতিয়া,
উড়িছে চকোর অযুত পালে।

১১

শশিতনুছটা পড়িছে উথলি
দেব-ক্রীড়াবন নন্দন উজলি—
মেরু, মন্দাকিনী, তরু-চূড়ায়;
কুসুম-আকৃতি অপ্সরা, কিন্নরী,
কর, বক্ষ, ক্রোড়ে, বাদ্য-যন্ত্র ধরি,
শুয়ে সারি সারি লতা পুষ্প প'রে,
বিমল চন্দ্রমা-কিরণে বিহরে—
পারিজাত-ফুলে শচী ঘুমায়।

১২

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,—
মানব-কুমার সভয়ে চকিত,
শুনিল গম্ভীর জীমূত-নাদ।
দেখিল আতঙ্কে নয়ন ফিরা'য়ে
গগন-উপান্তে, একত্রে জড়া'য়ে
খেলিছে অসংখ্য বিজলি-ছাঁদ।

১৩

অধোদেশে তার অনন্ত-বিস্তার,
কারণ-জলধি পরি বীচিহার,
উথলিছে রঙ্গে, প্রসারি ধারা;
গহ্বরে গহ্বরে উপকূল-ধারে,
প্রচণ্ড হুঙ্কারে মারুত-প্রহারে,
ভাঙ্গিতে যেন বা বন্ধন-কারা।

১৪

উপকূল-ধারে, অনল-কুণ্ডেতে,
শিখর-প্রমাণ শিখার শুণ্ডেতে,
অনল উঠিছে গগন-ভালে

যেন ঐরাবত ছুটিয়া পবনে,
ঘোর আকর্ষণে গভীর গর্জ্জনে,
জল-স্তম্ভ ধরি শুণ্ডেতে উগরি,
ফেলিছে তুলিছে জলদজালে।

১৫

কারণ-সাগরে, পরমাণু করে,
অনাদি পুরুষ বসি ধ্যান-ভরে
ছাড়িছে নিশ্বাস—জন্মিয়া তায়
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া,
অসীম অনন্ত আকাশে উঠিয়া,
ছুটিছে অনল-স্ফুলিঙ্গ প্রায়।

১৬

কত সূর্য্য, তারা, কত বসুমতী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কত, অস্ফুট মূরতি,
ভাসিয়া চ'লেছে কারণ-জলে ;—
কত বসুন্ধরা, রবি, শশী, তারা,
জগত ব্রহ্মাণ্ড, হ'য়ে রূপ-হারা,
খসিয়া পড়ি'ছে, সলিলে ডুবিছে,
কারণ-বারিধি অতল তলে।

১৭

সে বারিধি হ'তে চলেছে ছুটিয়া
দেখিল মানব পুলকে পূরিয়া,
কালের তরঙ্গ বিপুল-কায় ;
বহিছে দ্বিধারে দ্বিবিধ প্রকারে,
এক ধারা-পরে, মানব-আকারে,
কতই পরাণী ভাসিয়া যায়।

১৮

অমল কমলে ভাসিছে সকলে,
ধনুর্দ্ধারী কেহ, কারো করতলে
লেখনী পুস্তক বিস্তৃত রয়।

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,
জগতে শুধুই ইহারা জাগ্রত,
"মা ভৈ—মা ভৈ" গভীর উচ্ছ্বাসে
স্বজাতি ডাকিয়া চ'লেছে উল্লাসে—
কালের তরঙ্গ করিয়া জয়।

১৯

সে নর-মণ্ডলে মানব-কুমার,
স্বজাতি হেরিল কত আপনার,
পুলকে পূরিল মোহিত হ'য়ে ;—
বাজিল দুন্দুভি সহসা অমনি,
সুদূর গগনে হলো দৈববাণী,—
"দেখ রে মানব এ দিকে চেয়ে !"

২০

দেখিল চমকি অন্য ধারা-তীরে,
গভীর চিন্তায় পদ ফেলি ধীরে,
চ'লেছে ধরিয়া প্রবাহ-ধারা,
প্রাণী কয় জন পুলকিত চিত,
"মা ভৈ" নিনাদ শুনিয়া স্তম্ভিত,
দেব-ছটা যেন বদনে ভরা।

২১

পশ্চাতে তাঁদের করি জয়ধ্বনি,
চলেছে কতই মানব পরাণী
ভেরী শঙ্খনাদে করি ঘোরধ্বনি,
সাগরহুঙ্কারে উথলে গীত ;
উথলে সঙ্গীত-নিনাদ গভীর—
"হো'ক না কেন সে মাটীর শরীর,
মানবের জাতি কখনও লীন,
হ'বে না সমূলে ক্ষিতি যত দিন—
তবে রে পরাণী কেন ভাবিত ?"
ডাকিছে আবার আনন্দ-আরবে—
"সময়-বিজয়ী প্রাণী যারা সবে,
গাও রে উল্লাসে অমর-গীত।"—

২২

"দেব-অংশে জন্ম, পর দেবমালা,
কর মর্ত্ত্যভূমি জগতে উজালা;
দনুজারি-তেজে অবনী-অঙ্কেতে
কর সিংহনাদ বিজয়-শঙ্খেতে,
জাগুক জগতে মানব-নাম;
জাগুক ত্রিদিবে দেবতামণ্ডলী,
দানব গন্ধর্ব্ব হ'য়ে কুতূহলী,
দেখুক চাহিয়া অক্ষি খুলিয়া,
ত্রিলোক-উজ্জ্বল মানব-ধাম!"

২৩

সে গীতের সহ ঘন ঘোর স্বরে,
বাজে শৃঙ্গনাদ, শুনিল অন্তরে,
দেখিল চাহিয়া নর-কুমার—
শত শত দলে পরাণী সকলে,
করি সিংহনাদ মহা গর্ব্বে চলে,
বলে উচ্চৈঃস্বরে ধরণীমণ্ডলে—
"একতার সম কি আছে আর।"

২৪

"একতার গুণে বিজিত অমরে
কতকাল দৈত্যে যুঝিলা সমরে;
দৈত্যকুলে নাশ করি, মুণ্ডমালা
পরে মহাকালী দনুজারিবালা,
নির্দ্দৈত্য করিয়া অমরবাস!"
একতা সাধিতে এ মর-ভবনে,
কত মহাজন প্রাণ দিয়া রণে,
গেল স্বর্গে চলি দিয়া নরবলি,
অবনী-দানরে করিয়া নাশ।"

২৫

"এ মর্ত্ত্যপুরীতে সেই ধন্য জাতি,
একতার জ্যোতি বদনেতে ভাতি,

তেজোগর্ব্ব ধরি থাকে নিজ বাসে,
হেরে পুত্র দারা প্রাণের হরষে,
হাসিতে কাঁদিতে করে না ভয়;
করে না কখন পায়ে অর্ঘ্য দান,
পর-পদ-তলে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
কৃতাঞ্জলি করে, ভীরুতার স্বরে,
বলে না কখন ঘাতকে জয়।"

২৬

"একতাই মর্ত্ত্যে মানব-সম্বল,
একতা বিহনে পরেরি সকল,
দারা পুত্র গৃহ যা আছে তোর,
সে ধন বিহনে আলয়-বিপিনে,
জীবন-আস্বাদ পাবি নে পাবি নে—
দিবস শর্ব্বরী সকলি ঘোর।"

২৭

হরষিত-তনু কদম্বের প্রায়,
মানব-নন্দন দেখে পুনরায়,
সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় আকৃতি,
প্রাণী কয় জন প্রফুল্ল নয়ন,
প্রকৃতি-প্রতিমা করিয়া ধারণ,
করিয়া ধারণ বায়ু, জলধারা,
শনি, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, তারা,
রাহু, রবি, কেতু, শশীর পরিধি,
অথবা পৃথিবী, অতল জলধি,—
গায়িছে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন-গীতি।

২৮

"তেজঃপিণ্ডবৎ, ধূম, বাষ্পময়,
ছিল এ ধরণী ধাতু-শঙ্খালয়,
ক্রমে মৃণময় মীন-কূর্ম্মবাস,
তৃণ, তরু, মৃগ, মনুর আবাস,—
সাজিল ধরণী অপূর্ব্বকায়।

চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,
এই শশধর, আরো কত ক্ষিতি,
চারি চন্দ্র-শোভা ঘেরে বৃহস্পতি ;
জ্যোতি-উপবীত প'রে মনোহর,
ল'য়ে সপ্ত শশী ভ্রমে শনৈশ্চর ;
ভ্রমে কেতুমালা তপনে বেড়িয়া,
অনন্ত গগনে পরিধি আঁকিয়া ;—
তারকা-কুসুম ছড়ান তায়।"

২৯

"ফিরাব বেগেতে পবনের গতি,
তরল বায়ুতে শবদ-শকতি
রাখিব স্থাপিয়া, দেখিব খুলিয়া
রবির কিরণ-গঠন-প্রথা ;
আনিব নামায়ে ভীষণ অশনি
পৃথিবী উপরে,—বাসব-শিঞ্জিনী
বাঁধিব সুন্দর দামিনী-লতা।
চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
দিবাকর পাশে দেখিব গগনে,
তারকা-কুসুম ছড়ান তায় !"
গায়িতে গায়িতে চলেছে সকলে
এই মহাগীত, ভীম কোলাহলে—
নিয়তি-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পায়।

[হেমচন্দ্র।

ঊষা।

অদিতি-নন্দিনী, ঊষা বিনোদিনী,
প্রফুল্লবদনা, মধুরভাষিণী,
আলোকবসনা, কুসুমমালিনী,
এস তুমি, দেবি, অবনীতলে,

হাসিতে হাসিতে নয়নভঙ্গিতে
আনন্দের ধারা ঢালিতে ঢালিতে
স্বর্গীয় সৌরভ শ্রীঅঙ্গ হইতে,
বর্ষিতে বর্ষিতে করুণাবলে ;

যথা স্বয়ংবরে নবীনা যুবতী,
রূপের আভায় পূরিয়া জগতী,
চলে সভাতলে মৃদু মন্দ গতি
নানা অলঙ্কার পরিয়া অঙ্গে ;
কিংবা রে যেমতি পতির মিলনে
যায় রূপবতী সহাস্য বদনে,
সাজাইয়া দেহ বিবিধ ভূষণে,
ভাসিতে ভাসিতে সুখ-তরঙ্গে ;

অথবা যেরূপ সলিল হইতে
সরোবর-কূল শোভিতে শোভিতে
উঠে একাকিনী সুন্দরী নিভৃতে
রম্যতর কান্তি সরসী-স্নানে ;
কিম্বা যথা আশা সাহস-নন্দিনী,
অঙ্গের আলোকে উছলি মেদিনী,
ধায় তাড়াইতে দুখের যামিনী,
মোহিয়া সকলে মধুর গানে।

প্রণয়ের রাগে রঞ্জিত তপন,
মধুরতাময়, সতেজ দর্শন,
ছুটে পিছে পিছে উৎসুক লোচন,
চুম্বিতে তোমার বিকচ মুখে ;
ভরসার ভরে আসিয়া সত্বরে,
অম্বরে তোমায় প্রেমানন্দে ধরে,
প্রাণের মিত্রের হেম কলেবরে
মিশহ অমনি পরম সুখে।

দেখেছ যদিও যুগ যুগান্তর,
অনন্তযৌবনা তুমি নিরন্তর ;
প্রত্যহ নবীনা নববেশ ধর,
সাজাতে নিয়ত নূতন অঙ্গ।
রাশিচক্রে ঘুরি উঠি প্রতিদিন,
দেখিতেছ ক্রমে কত জাতি ক্ষীণ,
কত বংশাবলী· ক্রমশঃ বিলীন,
অবনীমণ্ডলে কালের রঙ্গ।

বিচক্ষণবুদ্ধি বৃদ্ধ শ্বেতকেশ
কৃতান্তকবলে করিছে প্রবেশ ;
উঠি তার স্থলে যুবক বীরেশ
নবদম্ভভরে শাসিছে ধরা ;
সেও লুকাইছে কিছু দিন পরে,
তার পদে আসি উঠিছে অপরে ;
এইরূপে ভাসি কালস্রোত'পরে
চলিছে শৈশব, যৌবন, জরা।

প্রতাপে প্রমত্ত কত নরপতি
তুলি জয়কেতু মৃত্যুর সংহতি,
সমরে অমর, কীর্ত্তির সন্ততি,
তোমার সমক্ষে পাইছে ক্ষয় ;
বৃহৎ সাম্রাজ্য বীর-বিভূষিত
ধরণীমণ্ডল করিয়া কম্পিত,
তোমার সম্মুখে কত বিগলিত,
হেরিতেছ তুমি কালের জয়।

কিন্তু নারে কাল জিনিতে তোমারে,
আদি হৈতে তুমি আছ একাকারে,
হাসিতে হাসিতে প্রত্যহ ধরারে
নব নব বেশ দিতেছ তুমি ;

অমরমাধুরী, অচলযৌবনা,
নূতনবসনা, নূতনভূষণা,
নিয়ত নবীনা, প্রফুল্লবদনা,
অটল-বিমল-লাবণ্য-ভূমি।

নক্ষত্র-কুসুম নীলাম্বর-শিরে,
শ্যামাঙ্গী যামিনী লুকায় অচিরে
তোমার প্রভায়, যবে ধীরে ধীরে
উঁকি তুমি দাও উদয়াচলে।
ধরণীর দেহ করি পরিহার
পলাইয়া যায় ঘোর অন্ধকার,
নূতন সৌন্দর্য্য ছুটে অনিবার,
মুক্ত যেন শশী রাহু-কবলে।

জীবের জীবন তুমি অবনীতে,
তব আগমনে উঠে আচম্বিতে
মৃত্যু-সহোদরা-নিদ্রাঙ্ক হইতে
জাগি জীবকুল সুখ-হিল্লোলে;
বসি তরুডালে বিহঙ্গমগণে
সঙ্গীত বরষে নিকুঞ্জে, কাননে;
মনের বাসনা পূরিতে যতনে
মিশে গিয়া লোকে কর্ম্ম-কল্লোলে।

অর্থের আকাঙ্ক্ষা, পদের লালসা,
জয়ের প্রত্যাশা, প্রেমের ভরসা,
কীর্ত্তির কামনা, সম্ভ্রমের তৃষা,
আনন্দের বাঞ্ছা, বিদ্যানুরাগ,
এইরূপ কত বাসনার বশে,
মায়ার বাজারে নরগণ পশে,
জাগি উঠি সবে তোমার পরশে;
তব বাক্যে করি আলস্য ত্যাগ।

তোমার প্রসাদে ছুটে নববল,
উঠে কর্ম্মস্থলে করম সম্বল,
ফুটে কাম্যবনে আহ্লাদ-কমল,
জগতে নূতন শোভা বিরাজে ;
তোমার কৃপায় কবিতা উদিত,
মনোহর শিল্প রঙ্গে বিকশিত,
বিজ্ঞান নিয়ত নব পল্লবিত,
ধরম নূতন ভূষণে সাজে।

(উদয়-অচলে উঠিতে উঠিতে,)
পুরাকালে তুমি পাইতে দেখিতে
উৎসুক উল্লাসে তোমায় পূজিতে,
(আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ;)
চাহি দেখ, দেবি, এখন আবার,
তোমার চরণে দিতে উপহার,
আনিয়াছে নব কবিতার হার,)
এই দীনহীন অধম জন।)

পুরাকালে তুমি যেমন হাসিতে,
এখনো হাসিছ ভারতভূমিতে,
পুরাকালে যথা সৌন্দর্য্য বর্ষিতে,
এখনো বর্ষিছ প্রত্যহ আসি ;
এখনো তেমনি সুমধুর স্বরে
গায় তব গুণ বিহঙ্গ-নিকরে,
গায়িত যেমন ভারত ভিতরে
পুরাকালে সুখ-সাগরে ভাসি।

সেই হিমাচল তুষার-মণ্ডিত,
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর উত্তরে শোভিত,
সেই সপ্ত-সিন্ধু পশ্চিমে বাহিত,
পুরাকালে যাহা দেখিতে তুমি ;